ইনসোমনিয়া

বরেন চক্রবর্তী

হিথরো থেকে ঢাকা কতদূর। একটানা এগারো ঘণ্টা প্লেনে জবুথবু হয়ে বসে থাকা অনেক সময়ই অসহ্য মনে হয়। আজকের এই জার্নিটাও ছিল একেবারেই আলসে। কোথাও ভ্রমণে গেলেই ইন্দ্রনীলের পাশের সীটে থাকে ছ'বছরের মেয়ে অন্টি। একদন্ড কোথাও স্থির হয়ে বসে থাকার মতো মেয়ে সে কখনও নয়। ককপিট থেকে যখন সিগন্যাল আসে বেল্ট বেঁধে নেয়ার তখনও অন্টিকে দেখা যাবে ককপিট থেকে টেইল পর্যন্ত ইতস্তত ঘোরাঘুরি করতে। পাইলট কিংবা এয়ার হোস্টেস কাউকেই সে তোয়াক্কা করে না কোনদিন। বরং প্রতি যাত্রাতেই সে প্লেন থেকে নামে এয়ার হোস্টেসদের বিরুদ্ধে এন্তার অভিযোগ নিয়ে। কেউ তাকে পছন্দসই খাবার দেয়নি, কেউ তাকে ককপিটে ঢুকতে দেয়নি, কেউ ইচ্ছামতো চকলেট কিংবা ড্রিংকস দেয়নি, আরো অনেক অভিযোগ। অন্টি ছাড়া যে কোন বিমান যাত্রাই ইন্দ্রনীলের কাছে অতিশয় পানশে। বিমানের গতিপ্রকৃতি দেখে বুঝা যাচ্ছে হুহু করে সে নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে। একটু আগেই ওরা ছিল ছত্রিশ হাজার ফুট অলটিচিউডে। আকাশ বেয়ে প্লেন নামছে মাটির দিকে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আর পনের-বিশ মিনিট পরেই বিমানের চাকা ঢাকার মাটি স্পর্শ করবে।

প্রতিবারই বিমান যখন নামতে শুরু করে তখন প্রথম টের পায় ইন্দ্রনীলের বৌ রিটা। অলটিচিউড চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে ওর কানে শুরু হয় ব্যথা। অনেক সময় ব্যথায় আক্ষরিক অর্থেই ও কুঁকড়ে যায়। তাই প্লেন নামতে শুরু করলেই অন্টি অনিবার্যভাবে মাকে তুলোর প্যাকেট এগিয়ে দেয়। তাই তাদের বিদেশ ভ্রমণের হ্যান্ড লাগেজে তুলোর প্যাকেটের উপস্থিতি একেবারেই অনিবার্য। তুলোর প্যাকেট যে দরকার এটাও মাকে মনে করিয়ে দেয় অন্টি নিজেই। ওরও কানে একটু-আধটু ব্যথা হয়। তবে তা মা'র মতো তীব্র নয়।

আজ রিটাও নেই, অন্টিও নেই। প্লেনটা যতোই নিচের দিকে নামছে বুকের একটা বড় অংশ ক্রমশই যেন কেন ফাকা হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ করেই প্লেনটা একটু ঝাকুনি খেল। এই বুঝি চাকা দুটি নামলো। রাত এখন চারটা। সময়টা রাত আর ভোরের সংগমস্থল। জানালা দিয়ে ইন্দ্রনীল তাকায় বাইরে। ঢাকার স্কাই লাইন এখনও

অস্পষ্ট। অবশ্য এটা হওয়াই স্বাভাবিক। হিথরোতে এসেই ইন্দ্রনীল জানতে পেরেছিল ঢাকার আবহাওয়া প্রতিকূল। গত দু'দিন একটানা ঝড়-বাদল গেছে। তাই বৃটিশ এয়ারওয়েজের এই ফ্লাইটটার সময় চেঞ্জ হওয়ারও আশংকা দেখা দিয়েছিল। তবু ভাগ্য ভাল প্লেন ঠিক সময়ই টেক-অফ করেছিল। ভোর রাত সোয়া চারটায় বৃটিশ এয়ারওয়েজের বোয়িং বিমানটি ঢাকার মাটি স্পর্শ করলো।

লাগেজ বেল্ট থেকে বাইরে আসতে কেটে গেল প্রায় আধা ঘণ্টা। ইউএনডিপি অফিস থেকে লোক আসার কথা ওকে রিসিভ করতে। ইন্দ্রনীল ইতিউতি চাইতে থাকে চারদিকে। অনেকের আত্মীয়-স্বজন এসে দাঁড়িয়ে আছে এয়ারপোর্টে নিতান্ত আপন লোকদের রিসিভ করতে। ইন্দ্রনীলের চোখের সামনে হাজারো অপরিচিত মুখের জটলা। হোটেল কিংবা অফিস থেকে অপরিচিত অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাতে রিসেপশনিস্টরা বুকে অতিথিদের নাম লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইন্দ্র সে প্ল্যাকার্ডে নিজের নাম খুঁজতে থাকলো। সামনে চাইলেই বুঝা যায় এটা একটা রুগ্ন শহর। চাদর মুড়ি দিয়ে বসে আছে থোকা থোকা মানুষ। যাত্রী বেরুলেই এক দঙ্গল ভিখেরি ঘিরে ধরছে তাকে। যেন এটাই নিয়ম। এরকম অনুভূতি ওর এই প্রথম। হিথরো, হনলুলু কিংবা ব্রাসেলস এয়ারপোর্টের সাথে একে মেলানো যাবে না কোনভাবেই। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে মানুষকে সমৃদ্ধ করে।

আবছা অন্ধকারে নিজের নাম খুঁজে পেতেই কষ্ট হচ্ছিল ওর। হঠাৎ করে বাঁ দিকের কোণে চোখ যেতেই অস্পষ্ট দেখতে পেল নিজের নাম। একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাতে নেইম প্ল্যাকার্ড নিয়ে। তাতে স্পষ্ট করে লেখা ইন্দ্রনীল বোস। ইউএনডিপি। হাত উঁচু করতেই মেয়েটি বুঝে নিল এই মানুষটিই তার অতিথি। 'ওয়েলকাম টু বাংলাদেশ' বলেই মেয়েটি ইন্দ্রনীলকে গাড়িতে নিয়ে গেল। এক নতুন অভিজ্ঞতা। মেয়েটির বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। সে নিজেই বললো তার নাম ইয়াসমিন আলী এবং সে রেসিডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ-এর পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট। ইন্দ্রনীল আবার ইয়াসমীনের মুখের দিকে চাইলো। অর্থাৎ আজ থেকে ইয়াসমীনই তার পিএ। এই রেসিডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভের পোস্ট নিয়েই ইন্দ্রনীল উড়ে এসেছে সুদূর নিউইয়র্ক থেকে।

চারদিকে তখনও অন্ধকার। ইয়াসমিন বলল, গতকাল রাতে ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেছে রাজধানীর আশপাশ দিয়ে। এখন তাই চারদিকে গুমোট ভাব। গাড়ির কাঁচের ভেতর দিয়ে এখনও যেটুকু দেখা যায় তা নিতান্তই অস্বচ্ছ। গাছ-গাছালির দিকে চাইলেই বুঝা যায় গতকাল রাতে তান্ডব বয়ে গেছে শহরের ওপর দিয়ে। চারদিকের পরিবেশ তাই সদ্য কৌমার্য-হারা নারীর মতো আলুথালু। ম্রিয়মাণ চারপাশ। স্তব্ধতা চারদিকে। রাজপথ জনশূন্য প্রায়। পাখিদের ঘুম তখনও ভাঙ্গেনি। গাছের পাতায় পাতায় তন্দ্রার মতো লেপ্টে আছে আবছা আবছা অন্ধকার। দূরে অদূরে সারি সারি ঘুমন্ত ঘর-বাড়ি। নিশ্চুপ উঁচু উঁচু ইমারত। যেন ইন্দ্রনীল পরিত্যক্ত নগরীর অপ্রয়োজনীয় অতিথি। জানালার কাঁচ নামিয়ে ইন্দ্র আকাশের দিকে চাইলো। এখনও আকাশে ট্রাফিকবিহীন মেঘের আনাগোনা। ঘন মেঘের ফাঁক-ফোকরে ভোরের আকাশে এখনও ঝুলে আছে কিছু অবসন্ন দ্যুতিহীন তারা।

কাক-ভোরেই পৌঁছেই গেল গন্তব্যে। গুলশানের এই বাড়িটা শুধু ইন্দ্রনীলের জন্যই ভাড়া করা হয়েছে। বাইরে থেকেই বুঝা যায় একজন মানুষের থাকার জন্য আবাসটি অসম্ভব বড়। এক কথায় বিশাল বাড়ি। একজন মানুষ এ রকম একটা বাড়িতে একা থাকবে নিউইয়র্কের মানুষরা তা যেন কল্পনাও করতে পারবে না। সব কিছু ছিমছাম ও সুরুচিপূর্ণ। কিন্তু কেন যেন মনে হয় সব কিছুই অতিরিক্ত বাহুল্যে ভরা, প্রয়োজনের চেয়ে বেশি আসবাব। একটি মাত্র মানুষের জন্য অনেকটা দৃষ্টিকটু। একতলা বাড়ি, যাতে পাঁচটি ঘর। ড্রাইংরুম বেশ বড়-সড়। তিনটি আকর্ষণীয় পেইন্টিং তার শোভা বাড়িয়ে দিয়েছে অনেকখানি।

সকালের ব্রেকফাস্ট রেডি। একজন মানুষের জন্য তিন জন কাজের লোক। কোন কিছুই নিজের করার নেই। একটা শক্ত সামর্থ্য মানুষকে যন্ত্রচালিত মানুষে পরিণত করতে এ ধরনের ভাল বাসাই যথেষ্ট। একসাথে ব্রেকফাস্ট খেয়ে ইয়াসমিন চলে গেল অফিসে। সাথে নিয়ে গেল রিটার কাছে ই-মেইল করে ইন্দ্রনীলের পৌঁছার সংবাদ দেয়ার দায়িত্ব। দু'দিন অফিসে যাওয়ার ঝামেলা নেই। অফিসের ডিরেক্টর ফোন করে বলে দিয়েছে শুধু রেস্ট করতে। বিকেলে উনি আসবেন দেখা করতে। সারাগায়ে ইন্দ্রনীলের জেট-ল্যাগের ঘোর লেগে আছে।

টানা এগারো ঘণ্টা ফ্লাইট। তার ওপর আবহাওয়া খারাপের জন্য ছিল অতিরিক্ত বাম্পিং। সব মিলিয়ে শরীর ও মন দুটোই ভাল নেই। অবসন্নে তাই নেতিয়ে পড়ে বিছানায়। পর্দার ফাঁক দিয়ে ঢোকা সকালের এক ফালি আলতো রোদ কাত হয়ে পড়ে থাকে ওর ওপর। কখন যে ঘুম এসে গেল তা কেউ জানে না।

ঘুম ভাঙ্গে দুপুর দুটা নাগাদ বেয়ারার ডাকে। জেট ল্যাগটা বেশ কমেছে। কিন্তু মনের অবসন্নতা একটুও কমেনি। হয়তো বাড়ছেই। বেড সাইড টেবিলে রাখা আজকের খবরের কাগজ। একটা নয়, দুটা নয়, বাংলা-ইংরেজীতে মিলিয়ে চারটা। ওরা কি জানে ইন্দ্রনীল বাংলায় কথা বলতে পারে? আটাশ বছর আমেরিকার বাসিন্দা হলেও ইন্দ্র'র ছেলেবেলা কেটেছে কলকাতায়। তাই বাংলা ওর দ্বিতীয় ভাষা। বিচ্ছিন্নভাবে ইন্দ্রনীল পেপার পড়তে থাকে। প্রায় সব খবরই ওর কাছে অপ্রয়োজনীয়। শুধু সময় কাটানোর জন্য পড়া। সব ক'টি কাগজের নিউজ ট্রিটমেন্ট প্রায় এক। প্রথম পাতার দিকে চাইলে মনে হবে এদেশে দুটো কাজই নিয়মিত হচ্ছে– একটি খুন আর অপরটি ধর্ষণ। অবশ্য এরকম একটা ব্যাপার আঁচ করতে পেরেছিল ও এদেশে আসার আগেই। দু'মাস আগে ও যখন পোস্টিং অর্ডারটা পেল তখনই দৌড়ে গিয়েছিল ওর বন্ধু আব্রাহামের কাছে। কারণ আব্রাহাম পাক্কা পাঁচ বছর কাটিয়ে গেছে ঢাকায়। একটা বীভৎস বর্ণনা শুনেছিল এই দেশ আর তার মানুষগুলো সম্পর্কে। আব্রাহাম বলেছিল, বাংলাদেশ ইজ এ কান্ট্রি অফ সুপারলেটিভ ডিগ্রি। যে ধনী সে বেশি ধনী আর যে গরীব সে বড়ো বেশি গরীব। শুধু কিছু অথর্ব লোক আছে মাঝামাঝি অবস্থানে। এ দেশে খুন কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। খুনটি ডাবল না ট্রিপল তাই বিবেচ্য। ধর্ষণ হলে তা সিঙ্গল, ডাবল না গণধর্ষণ তা নিয়ে আলোচনা চলে। এদেশের নীতি-নির্ধারকরা হত্যাকারীর বিচারের চেয়ে নিহতের পুনর্জীবন অথবা স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য বেশি ব্যাকুল। যেসব জিনিস কখনও হবার নয়, তাই নিয়ে তারা কাজ করে যাচ্ছেন অহর্নিশি। পেপারগুলো একনজর দেখেই ইন্দ্র বুঝলো আব্রাহামের পর্যবেক্ষণ কতোটা সঠিক। সাওয়ার সেরে লাঞ্চ করতে করতে বেজে গেল তিনটা। সোয়া তিনটার দিকে এখানকার বস মিস্টার পিটার অ্যালেন শুধু ক'মিনিটের জন্য হ্যালো বলতে এলেন। কোন কথা বলার লোক নেই। আর কেউ আসবে না দেখা করতে। কেউ নেই আপন। চলে আসার দুঃখ। দূরত্বের অসহায়তা। চারদিকে সবাই অপরিচিত। ইন্দ্রনীল ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়। তকতকে ঝকঝকে ঘর, অভিজাত চারপাশ কিন্তু জীবনের রং আচম্বিতে ফিকে, একেবারে হাসপাতালের দূরারোগ্য রোগীদের মতো বিবর্ণ। ইন্দ্র দৃষ্টি প্রসারিত করে বাইরের দিকে। যতোদূর দেখা যায় ও দেখতে চেষ্টা করে। ও শুধু তাকিয়ে থাকে। তাকিয়েই থাকে। এই অচিন দেশে থাকতে হবে একা, একেবারেই একা। বাড়ির সামনের পার্কটা এখন জনশূন্য, বাইরে কনকনে রোদ্দুর। এ সময় কেউ পার্কে আসবে না। ইন্দ্রনীলের চোখের সামনে এক ফালি সবুজ শুধু ধু ধু করে। ইন্দ্রনীলের চোখের সামনে শুধু রূপহীন, রসহীন নিঃসঙ্গ জীবন। কতোদিন এভাবে কাটবে কে জানে। পাঁচ বছর, না তার চেয়েও বেশি। রিটা আর অন্টি এ দেশে এসে কখনও থাকবে না। তাই যাওয়া-আসা করেই কাটিয়ে দিতে হবে সামনের ক'টা বছর। আগামী দিনের প্রতিটি প্রভাত আসবে শুধু ক্লান্তিকর জীবনের পুনরাবৃত্তির জন্য। সামনে একটি অর্থহীন দুঃস্বপ্ন। চোখের সামনে সব কিছু ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

বিকেল গড়িয়ে প্রতিদিন সন্ধ্যা হয়। রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে নিয়ম মাফিক। বিকেল গড়িয়ে যায় সন্ধ্যায়, সন্ধ্যা লীন হয় রাতের আঁধারে। সব চলে নিয়ম মাফিক। শুধু নিয়মে চলে না ইন্দ্রনীলের যাপিত জীবন। ওর চারদিকের বাতাসে শুধু কম্পমান দীর্ঘশ্বাস। গতকালও ঘুম হয়নি। আজো একই অবস্থা। প্রচণ্ড ডিপ্রেশন। গভীর অবসাদ আর ক্লান্তি ছেয়ে থাকে দেহমনে। যেন ও নির্জন দ্বীপের বাসিন্দা। রাতে নিরন্তর নির্ঘুম। রাত যায় বীভৎস উৎকণ্ঠায়। রাত বাড়লেই মনে পড়ে রিটা আর অন্টিকে। রাতে অন্টি কি করে কে জানে? ও কি রাতে টিভি'র সামনে বসে বাবার জন্য অপেক্ষা করে, না বাবাকে সারপ্রাইজ দেয়ার জন্য উতলা হয়ে আছে। ইন্দ্রনীল পাশে না থাকলে অন্টির রাতের ঘুম বারবার ভেঙ্গে যায়। তখন রিটা কি বলে ওকে সান্ত্বনা দেয় কে জানে?

২

আজ প্রথম অফিস। অফিসে প্রথম ইমপ্রেশন যে করেই হোক ভাল হতে হবে। বুকে যতো দুঃখবোধই থাক

কিন্তু মুখ থাকতে হবে প্রাণবন্ত। ড্রেস পরে ইন্দ্র দাঁড়ায় ড্রেসিং টেবিলের সামনে। চেহারায় রেজার সার্প তীক্ষ্ণতা নেই ওর। তবে চোখমুখ সব সময় বুদ্ধিদীপ্ত ও মিষ্টি। ঋজু তার চলার ভঙ্গি আর সফেদ পোশাকে সব সময়ই ও সজীব। ইন্দ্রনীলের কথার মিষ্টতা, সহজতা আর সরলতা সবাইকে আকর্ষণ করে। এ পৃথিবীতে যারা অকারণে হাসতে পারে ও তাদেরই একজন।

নিজের অফিসে না গিয়ে ইন্দ্রনীল সটান চলে গেল পরিচালকের রুমে। আজকের অফিস একেবারে ফর্মাল। শুধু সবার সাথে চেনা-জানা। অল্প সময়ে সবাইকে জেনে নেয়া। অফিস বস মিঃ পিটার অভ্যর্থনা জানালেন নিজ ঘরে। ভদ্রলোক সুইডিশ। এদেশে আজ প্রায় চার বছর। নিজের কাজ সম্পর্কে ইন্দ্রনীল আগে থেকেই জানত। কারণ এ পোস্টে ইউরোপ আর আফ্রিকাতে ও কাজ করে আসছে টানা এগার বছর। এক কাপ ব্ল্যাক কফি খেয়ে মিস্টার পিটার ওকে নিয়ে বের হলেন পরিচয় পর্ব শেষ করার জন্য। প্রথমেই ডাইরেক্টরের পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট মিস অ্যানি। হাই বলেই ডান হাত বাড়িয়ে দিল অ্যানি একেবারে বিদেশী কায়দায়। ওর হাবভাব দেখে বুঝা যায় বিদেশীদের সাথে কাজ করে আদব-কায়দা রপ্ত করেছে বেশ। ইন্দ্রনীলের প্রধান কাজ মেডিক্যাল ডেমোগ্রাফি নিয়ে। ওর পিএইচডি ডিগ্রীটাও একই বিষয়ে। তাই ওর বেশির ভাগ কাজই ডাক্তারদের নিয়ে। এখানে ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট তিনজন ডাক্তারই মহিলা। প্রথমে পরিচিত হলো ডাক্তার নাহারের সাথে। বেশভূষায় আচারে ব্যবহারে এদেশীয়। বলা যায় ছিমছাম বাঙ্গালী সুন্দরী। বেশ ভাল লাগলো ইন্দ্রনীলের। দ্বিতীয়জন ডাক্তার সঞ্চিতা। বয়স হয়তো চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। সিঁথিতে লালটে আভা দেখেই বুঝা যায় সে হিন্দু। দ্বিতীয় এই ডাক্তারটির গ্রীবাভঙ্গি, স্ফূরিত অধর, ববছাঁট চুল, দু'চোখের ওপরে জ্যামিতিক জ্যার মতো ছাঁটা ভ্রু দেখেই মনে হয় এই মেয়েটি অতিশয় আধুনিকা। নিখুঁত টোল আর ঠোঁটের পাশের জারুলটি ঈষৎ উত্তেজক। ভদ্রমহিলার বাচনভঙ্গিতেও অহংকারের গন্ধ আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে আপন সৌন্দর্যভারে সে নিজেই বিব্রত। তৃতীয় ডাক্তারটির ঘরে ঢুকে ইন্দ্রনীলের দৃষ্টি হঠাৎ করেই থমকে যায়। কেন যেন বারবার চোখের দৃষ্টি কেঁপে যাচ্ছে। মিস্টার পিটার পরিচয় করিয়ে দিলেন ডাক্তারটির সাথে। নাম ক্যাথেরিন রোজারিও। নামেই বুঝা যায় ও খৃস্টান। বয়স ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের ভেতর। যথার্থ দীর্ঘাঙ্গি, সুন্দর একহারা চেহারা। অস্বাভাবিক সুন্দরী তাকে বলা যায় না, তবে একটা অদ্ভুত দীপ্তি ছড়িয়ে আছে সর্বাঙ্গে। দীঘির জলের মতো টলটলে দু'চোখ, তাতে ব্যক্তিত্বের তীক্ষ্ণতা স্পষ্ট। কালো চুলের থোকায় লেগেছে শুভ্রতার স্পর্শ। নিটোল মুখাবয়বে শুধু ঠোঁট দুটিই ঈষৎ মোটা। তবুও কেন যেন মনে হয় অপার ভালবাসার মধুতে জড়ানো ঐ চোখমুখ। ক্যাথেরিন মূর্তির মতো ক্লাসিক্যাল সুন্দরী নয়, তবু কেন যেন মনে হয় পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্য চোখ দুটোতে বাসা বেঁধে আছে। সাধারণত পুরুষরা সরাসরি তাকায়, আর মেয়েরা তাকায় মুখ নিচু করে। ক্যাথেরিনের দৃষ্টিতে আড়ষ্টতা। শুধু ওয়েলকাম টু বাংলাদেশ বলতেই দু'তিনবার ঢোক গিললো। সহসা ইন্দ্রনীল নিজেকে সমঝে নেয়। দু'একটা কথা বলেই বের হয়ে যায় ক্যাথেরিনের ঘর থেকে।

রাতে ঘুম আসতে চায় না। এক ধরনের পাগলাটে অবশেসন ওকে তাড়িয়ে বেড়ায়। ঐ চোখ, ঐ মুখ কোথায় যেন আগেও দেখেছে। মন ক্রমেই উতলা হয়ে উঠে। ক'সেকেন্ডের দৃষ্টি বিনিময় হতেই কতো উচ্ছ্বাস। যার সাথে যার ভালবাসা হয় তা প্রথম দৃষ্টিতেই হয়। উইল রজার্স তো আর মিথ্যে বলেনি- You will never get a second chance to make a first impression একা থাকলে মানুষের অসহায়ত্ব আরো প্রকট হয়ে উঠে। মানুষ তখন অবলম্বন চায়। একটু আশ্রয় খোঁজে ভালবাসার জন্য। কাউকে নির্ভর করে সে ভাল থাকতে চায়। এটা কি দোষের? এতোদিনের সকল সংকল্প আর সংযম যেন ক্রমেই হেরে যেতে থাকে ঐ একজোড়া চোখের শান্ত অতল চাহুনির কাছে। ক্যাথেরিনের জন্য অন্য রকম একটা ভালবাসা ওর বুকে পল্লবিত হতে থাকে। ভালবাসার নিঃশব্দ সঞ্চারণ ও বুঝতে পারে। মধ্যরাতেও ইন্দ্র'র চোখে ঘুম আসে না। ও এসে দাঁড়ায় বারান্দায়। বাইরে নৈঃশব্দ্য। গাঢ় নীল আকাশে জ্বলে আছে অযুত-নিযুত নক্ষত্র। পৃথিবীর পানে তাকিয়ে ঝিকিমিকি হাসছে ভরভরন্ত চাঁদ। অগুনতি তারার দ্যুতি আকাশ জুড়ে। চরাচর জুড়ে অপরূপ জ্যোৎস্নার মায়া। শুধু ইন্দ্রনীলের বুকের ক্যানভাসে ভেসে ওঠে ক্যাথেরিনের দু'চোখ। শুধু আজ এক নজর ইন্দ্র দেখেছে ক্যাথেরিনকে। ক্যাথেরিন তন্বী নয় কিন্তু নিঃসন্দেহে তীক্ষ্ণ ও তিলোত্তমা। ভালবাসা আর ভাল লাগা এক অদ্ভুত খেয়াল। লক্ষ-কোটি মানুষের মধ্যে হঠাৎ কাকে ভাল লাগলো আর অমনি একটা মানুষ পৃথিবীর

বাদবাকি মানুষগুলো থেকে আলাদা হয়ে গেল। এ যেন একটা মানুষের কাছে আরেকটা মানুষের টোটাল সারেন্ডার। প্রথম দর্শনেই ক্যাথেরিনের প্রতি ইন্দ্রনীলের অব্যক্ত ভালবাসাটা যেন এক ধরনের অবশেসন হয়ে দাঁড়ায়। ওর বুকের স্কেচ বুকে শুধুই ক্যাথেরিনের ছবি, সেখানে প্রতিদিন ইচ্ছেমতো রং লাগিয়ে রঙ্গিন করে তুলতো হরেক রকম রঙ্গিন ভালবাসা। ঐ মেয়েটিকে ভালবাসাটা যেন ক্রমেই হয়ে ওঠে জীবনের একান্ত প্রয়োজন। ঠিক ডব্লিউ এইচ অডেনের- We must love one another or die- 'এসো ভালবাসি, না হয়তো মরি'র মতো। অফিস কিংবা কনফারেন্স রুমে, টি টেবিল কিংবা ব্রিফিং-এ ইন্দ্রনীল অনেক সময় অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকে ক্যাথেরিনের দিকে। যতক্ষণ ও অফিসে থাকে ততোক্ষণ জীবনকে আর অতোটা ছন্দহীন মনে হয় না। মাঝে মাঝে ইন্দ্রনীলের মনে হয় রবীন্দ্রনাথের মতো ওর একজন নারী দরকার, যে দেহ-সৌষ্ঠবে হবে লুসি স্কট আর মন-মানসিকতায় হবে কাদম্বরী কিংবা ইন্দিরা। অফিস থেকে বাসায় ফিরলেই সীমাহীন বিরক্তি। রাতে শুধু কম্পিউটারের সামনে বসে উপায়হীন খট খট খট আর নানান অক্ষর বসানোর খেলা।

ছ'মাস না পেরুতেই ইন্দ্রনীলের কাজের বৈচিত্র, নিভৃত চিন্তা আর প্রজ্ঞার গভীরতা ওকে অন্যদের থেকে আলাদা করে ফেললো। ইন্দ্রনীলের আচার ব্যবহার ত্রুটিবিহীন ও অনুকরণযোগ্য। কথাবার্তা পরিশীলিত ও অভিজাত। নিজের ব্রত ক্ষেত্রেই যেন ওর সতত পদচারণ। মেয়েদের রুদ্ধশ্বাস আর মুগ্ধ সমীহ আদায় করার জন্য ওর ব্যক্তিত্বই যথেষ্ট ছিল। অফিসে ইন্দ্রনীল কাজ করে আপন মনে। কখনও বাড়ী ফেরে রাত আটায় আবার কখনো তারও পরে। এমনকি শুক্রবারও অফিসে আসে। ঊর্ধ্ব অধঃ সকল কর্মচারীরা সবাই চলে যায় আপন ঠিকানায়, শুধু একা একা বসে থাকে ইন্দ্র। সকাল গড়িয়ে যায় বিকেলে, বিকেল সন্ধ্যায় আর সন্ধ্যা ছুটে চলে রাতের দিকে। ইন্দ্রনীলের কোন অনুভূতি নেই। ইন্দ্রনীল স্বপ্নবিলাসী কোন পুরুষ নয়, তবুও মাঝে মাঝে মনে হয় জীবনটা একেবারেই যারপারনাই শ্রীহীন।

ইন্দ্রনীলের ডিলিং অ্যাসিসট্যান্ট ডাঃ সঞ্চিতা রায়। রোজ তার সাথে অফিসে তিন-চারবার দেখা হয়, টেলিফোনে কথা হয় এরচেয়েও বেশি। কিন্তু ক্যাথেরিনের সাথে দেখা হয় অনিয়মিত। শুধু সাপ্তাহিক ব্রিফিং-এর সময় ক্যাথেরিনকে কাছে থেকে দেখতে পায় ইন্দ্র। তাছাড়া অফিসে, টি-রুমে অথবা করিডোরে ক'পলকের জন্য যেটুকু দেখা হয় তা হাই-হ্যালোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। হঠাৎ করেই অফিসিয়াল ট্রেনিং-এ এক মাসের জন্য বিদেশ যাচ্ছে ডাঃ সঞ্চিতা। ক্যাথেরিন নেক্সট সিনিয়র। চিঠিটা বসের অফিস থেকে পাওয়ার পরই ইন্দ্র মুহূর্তে বদলে যায়। আজ আটটা মাস ধরে ক্যাথেরিন নামের যে ছায়াহীন কায়া ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাকে অন্তত রোজ কয়েকবার সামনা-সামনি দেখা যাবে এবং কথা বলা যাবে আদি অন্তহীন। কেউ এতোটুকু সন্দেহ করবে না। আর এ পর্যায়ের দু'জন অফিসারের ভেতর কোন হৃদয়ঘটিত ব্যাপার-স্যাপার ঘটতে পারে তা নিশ্চয়ই এই বিদেশী অফিসের কারো ধাতে নেই। ব্যাপারটা যদিও একতরফা তবুও এক ধরনের চাপা ভয়, রোমাঞ্চের শিহরণ আর ভালবাসার আবেগ ওকে আন্দোলিত করে। নিষ্ফলা মনের জমিতে যেন বিন্দু বিন্দু প্রাণের সঞ্চালন।

ঐদিনই সঞ্চিতা ক্যাথেরিনকে জানিয়ে দিল এক মাসের প্রোগ্রাম। বিদেশ যাওয়ার আগে আরো দশ দিন সে ছুটিতে থাকবে। তাই এখন থেকে সবকিছু সামলাতে হবে ক্যাথেরিনকে।

–তুমি কি ইন্দ্র স্যারের সাথে কাজ করতে ভয় পাচ্ছ?

–মোটেই না। ভয় পাচ্ছি না, তবে কষ্ট হবে।

ইন্দ্রনীল ভয় পাওয়ার মতো মানুষ না। চলনে বলনে, কথায় কিংবা অঙ্গভঙ্গিতে সব সময় একটা সুনিপুণ হাল্কা মিষ্টি সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে মানুষটার ভেতর। রুচিসম্পন্ন পোশাক, সজীব প্রাণবন্ত চলাফেরা, তার সাথে ব্যক্তিত্বের মোহন ভঙ্গি। অমন মানুষকে কি কেউ কখনও ভয় পায়? ক্যাথেরিনের প্রবলেম অন্য জায়গায়। সে সঞ্চিতাকে বলে,

–ম্যাডাম, স্যার তো ভাল মানুষ, তবে এটাও সত্য লোকটা খুব পারফেকশনিস্ট। কোন কিছুই ফাঁকি দেয়া

যাবে না। কি হয় কে জানে?

–ধেৎ তোমার কিছু হবে না। স্যার তোমাকে খুব পছন্দ করে। আমার তো মনে হয় এ অফিসে তুমিই তার সবচেয়ে প্রিয়।

–কি যে বলেন না– কোনদিন ভাল করে কথাই হয়নি। এমনিতেই পছন্দের হয়ে গেলাম!

–যে হয় সে এমনিতেই হয়, আচমকা হয়।

–আপনার ধারণাটা কোত্থেকে এলো?

–আমার বয়স পাঁচচল্লিশ। পুরুষের চোখের ভাষা বুঝি না? প্রতি রোববার যখন ব্রিফিং-এ বসি তখন রোজ দেখি ইন্দ্র স্যার তোমার দিকে আনমনে অদ্ভুতভাবে তাকায়।

–ধেৎ এটা আপনার পাগলামি।

–হতে পারে। তবে এটুকু বলতে পারি তোমার দিকে উনার চাহুনি অন্য রকমের। ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ। এতে ভালই হলো। একজন মানুষের অন্য একজনকে ভাল লাগতেই পারে। এতে এমন দোষের কিছু নেই।

সঞ্চিতা ম্যাডামের কথাতে ক্যাথেরিন একটুও রাগ বা অভিমান করে না। আজ পাঁচ বছর হলো তার পাশে কাজ করে আসছে। তাই সঞ্চিতাকে ও ভালই চেনে। যা বলে সব সামনা-সামনি। কখনও দূরে কারো পেছনে লাগে না। আদ্যোপান্ত প্রগতিশীল। আজকের ঠুনকো ঘটনা কালকেই ভুলে যাবে বেমালুম। এ নিয়ে ক্যাথেরিন একটুও মন খারাপ করে না। ওর বয়সও চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষের কথা মন দিয়ে ভাবার অভ্যাস ওর চলে গেছে অনেক আগেই।

ডাক্তার সঞ্চিতা ছুটিতে গেছে গতকাল থেকেই। অফিসের প্রথম প্রহরেই ক্যাথেরিন ঢুকে ইন্দ্রনীলের অফিসে। এটা নিয়ম। তাই এ আসাটা নির্ভেজাল ফর্মাল। রোজ সকালে ওকে এখানে আসতেই হবে। ইন্দ্র'র ঘরে ক্যাথেরিন। প্রার্থিত প্রথম সূর্যের আলো যেন ঘরময়। ইন্দ্র তাকায় ক্যাথেরিনের দিকে। ইন্দ্রনীলের অনভ্যস্ত চোখের সে চাহনি কেন যেন একটু চমকে যায়। এই প্রথম ক্যাথেরিন বসে আছে ইন্দ্রনীলের টেবিলের ঠিক সামনে। নীরবতা ভাঙ্গে ক্যাথেরিন।

–স্যার আমিতো সঞ্চিতা ম্যাডামের মতো অভিজ্ঞ নই। কি করে যে ছ'সপ্তাহ চলবে কে জানে?

এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর ইন্দ্র খুঁজে পায় না। কথা যেন বারবার শুধু হারিয়েই যেতে চায়। ইন্দ্রনীল বারবার এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ক্যাথেরিনের দিকে। সে দৃষ্টি সুগভীর, স্থির, স্নিগ্ধ, অন্তরঙ্গ আর মায়াময়। ইন্দ্র'র অফিসে বসেই কম্পিউটারের স্ক্রীনে ডাটা প্রেজেন্ট করছে ক্যাথেরিন। সেদিকে কি খেয়াল আছে ইন্দ্রনীলের। পাখীর ডানা মেলা এক জোড়া ভুরুর নিচে ক্যাথেরিনের নম্র স্মিত হাসি। একেই কি বলে শ্রাবন্তীর কারুকাজ? কখনও কখনও ক্যাথেরিন মাথা উঁচু করে ইন্দ্র'র দিকে তাকায়। বারবার ক্যাথেরিনের সঞ্চিতা ম্যাডামের কথাগুলো মনে পড়ছিল। ও কথাগুলো মনে পড়লেই ওর মুখটা হয়ে উঠে ঈষৎ বিব্রত। ইন্দ্রনীল সরাসরি বা আড়চোখে বারবার তাকায় ক্যাথেরিনের মুখের দিকে। ওর ভাললাগা প্রথম দর্শনেই। প্রথম দিনই ক্যাথেরিনের চোখেমুখে ও দেখেছিল অসীম ব্যক্তিত্বের ছাপ। তবু আজ কেন যেন মনে হয় ক্যাথেরিনের চোখের মায়াময় ভাষার সাথে ব্যক্তিত্বের দূরত্ব যোজন যোজন। আশা-নিরাশার দোলাচলে ইন্দ্রনীলের হৃদস্পন্দন বারবার চঞ্চল হয়ে যায়।

অফিস শেষে ইন্দ্রনীল ফিরে যায় বাসায়। কিছুই ভাল লাগতে চায় না। তবে আজ ক'দিন থেকে নিজেকে আর আগের মতো নির্জীব নিরুৎসাহী মনে হয় না। কি যেন একটা চাপা উত্তেজনা মনের গহীনে বাসা বেঁধে আছে। মাঝে মাঝে ও ভয় পায়। পাছে ওর দৃষ্টি ক্যাথেরিনের কাছে ধরা পড়ে যায়। আজ রিটার ই-মেইল পেয়েছে। ও এদেশে আসতে চায় না। এখানকার সোশ্যাল সিকিউরিটির কথা জেনে ওর নাকি ঢাকায় আসার ইচ্ছা কর্পূরের মতো উবে গেছে। তাই আগামী মাসেই দু'মাসের ছুটি নিয়ে ইন্দ্রনীল যাবে আমেরিকায়। এতোসব

ভাবতে ভাবতে ইন্দ্র দাঁড়ায় বারান্দায়। মনের ভেতর একটা দুরন্ত আশা। যার আশা নেই, স্বপ্ন নেই তার মনও নেই। রাতের বেলায় ক্যাথেরিনের গভীর কালো মমতাপূর্ণ চোখ দুটো মনে পড়লেই হাল্কা এক ভালবাসার অনুভূতি ও টের পায় বুকের ভেতর।

মাত্র এক সপ্তাহের মাথায় ইন্দ্র আর ক্যাথেরিন একজন অন্যজনকে অনেকটা জেনে নিয়েছে। ক্যাথেরিনের স্বামী কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। সুইডিশ কোম্পানীর কান্ট্রি ম্যানেজার। দু'ছেলে নিয়ে সংসার। ইন্দ্রনীলের কাছ থেকে নিজে যেচে রিটা আর অন্টির ছবি দেখেছে ক্যাথেরিন। আজও সকাল বেলায় ইন্দ্র'র টেবিলের কাছে ক্যাথেরিন এসেছে। ব্ল্যাক কফির সাথে অফিসের খুটি নাটি কাজ শেষ হতে সময় লাগলো আধা ঘণ্টার মতো। এখনি ক্যাথেরিনের চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু ও যাচ্ছ না।

–স্যার একটা কথা বলবো যদি কিছু মনে না করেন?

–আপনার যা খুশী তাই বলেন, আমি কিছু মনে করবো না।

–যা খুশী তা বলবো কেন। ইমপরটেন্ট কথা বলবো।

–সে কথাটা কি?

–সেদিন ডিরেক্টর স্যার বললেন আপনি নাকি সব সময় ডিপ্রেসড থাকেন। আমাদের দেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছেন না। এটা কি ঠিক? আমাদের দেশটা কি এতোই খারাপ?

এ প্রশ্নের উত্তর ইন্দ্রনীলের নিজেরই জানা নেই। এ এক অদ্ভুত দেশে এসেছে সে। শুধু মানুষ নয়, এখানকার প্রকৃতির খেয়ালও বড়ো বিচিত্র। কোনদিন প্রচণ্ড বরষা আবার কখনও কখনও অসহ্য রোদ। কখনও ভিজিয়ে মারবে আবার কখনও পুড়িয়ে। কখনও আকাশ অমাবস্যার মতো ঘনঘুটে আঁধারে আচ্ছন্ন আবার কখনও তারায় তারায় খচিত। এখানকার মানুষের সোশ্যাল সিকিউরিটি প্রায় শূন্যের কোঠায়। এ দেশতো কারো পছন্দ হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ইন্দ্রনীলের ডিপ্রেশনের কারণ তো এ দেশের অসঙ্গতিপূর্ণ মানুষও না, এর প্রকৃতিও না। ইন্দ্রনীলের কেন ভাল লাগে না তা কি ক্যাথেরিন বোঝে?

–স্যার বৌদিকে এখানে নিয়ে আসেন।

–ওতো এখানে আসবে না । বন্ধুরা ভয় দেখিয়েছে।

–তাহলে!

–আমি যাচ্ছি। আগামী মাসে।

–কতো দিন থাকবেন?

–দু'মাস।

–দু....মা.....স। এতোদিন কেন?

কথাটা বলেই ক্যাথেরিন চুপসে যায়। ও বুঝতে পারে যাচ্ছেতাই একটা কথা ঠোঁট পিছলে এইমাত্র বের হয়ে গেল। ইন্দ্রনীল দু'মাস কি ছ'মাস তার বৌ-বাচ্চা নিয়ে থাক তাতে ওর কি এসে-যায়। এক নিমেষে ও ধাতস্থ হয়ে প্রসঙ্গ বদলায়। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বাভাবিক হয়ে বের হয়ে যায় নিজ ঘরে। মনের ভেতর এক অজ্ঞাত ভয়। ও কি বাজেভাবে ধরা পড়ে গেল?

প্রতিদিন দু'তিনবার ইন্দ্রনীল ক্যাথেরিনের অফিসে যেত। ডাক্তার সঞ্চিতার কাছেও সে এভাবেই আসতো। অফিসের কলিগ, এতে দোষের কিছু নেই। তবে ইদানীং যাওয়া-আসার মাত্রাটা ঈষৎ বেড়েছে। আজও বিকেলে ইন্দ্র এসেছে ক্যাথেরিনের অফিসে।

–স্যার এতো বারবার আসতে হবে না।

–তাতে কি?

–আপনি হলেন আমার বস। আমি যাবো আপনার কাছে। বারবার আপনি আসবেন কেন?

এরপর কি বলা উচিত তা ইন্দ্রনীলের জানা নেই। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ক্যাথেরিনের দিকে। মন শুধুই বলছে অস্তিত্বের এক অমোঘ উদ্ভাসকে ছুঁয়ে থাকার টানেই আমি বারে বারে তোমার কাছে আসি। সে কি তুমি বুঝ না? ইন্দ্রনীলের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুটা নরম হয়ে এলো ক্যাথেরিনের দৃষ্টি। সে দৃষ্টি হয়তো ভালবাসার অথবা ভাললাগার। এমনি করেই অফিসের কাজ আর নিজেদের একটু-আধটু ভাললাগার সাতকাহনে দেখতে দেখতে কেটে গেল দেড়টি মাস। হঠাৎ আবার ছন্দ-পতন। ডাক্তার সঞ্চিতা ফিরে এলো বিদেশ থেকে। ক্যাথেরিন ফিরে গেল নিজের কাজের বৃত্তে। এখন সাত-সকালে ইন্দ্রনীলের অফিসে ক্যাথেরিন আসে না। প্রতিদিন নিয়ম অনুযায়ী আসে শুধু সঞ্চিতা। যেমন সে আগে আসতো।

অফিসে রোজ দু'একবার ইন্দ্রনীল আর ক্যাথেরিনের দেখা হয় কিন্তু আগের মতো আর কাছাকাছি বসে দুজনের কথা হয়ে উঠে না। দুজনেই কথা বলতে ব্যাকুল তবু কেন যেন একটা অচেনা লজ্জা দুজনের ঠোঁটে সেঁটে থাকে। ইন্দ্রনীলও কিছু বলতে আড়ষ্ট হয়ে যায়, যা তার হওয়া উচিত নয়। এদেশে পুরুষরাই মেয়েদের সাথে আগ-বাড়িয়ে কথা বলে। কোন মেয়ে আগ-বাড়িয়ে আগ্রহ দেখালে পুরুষের সন্দেহ হয়। মেয়েরা ভালবাসার মানুষকে মনে-প্রাণে কাছে চাইলেও উপযাচিকা হয়ে আগ্রহ দেখায় না। অনেকে এটাকে হেংলামী মনে করে। ইন্দ্রনীলের মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে ক্যাথেরিনের অফিসে যেয়ে এক কাপ ব্ল্যাক কফি খেয়ে আসতে। কিন্তু এক অজানা সংকোচ ওকে বারবার বাধা দেয়। এমনকি দু'মাসের ছুটিতে আমেরিকা যাওয়ার আগেও ইন্দ্রনীল একটিবারের জন্যও ক্যাথেরিনের সামনে গেল না।

৩

ইন্দ্রনীল ছুটি নিয়ে নিজ দেশে গেছে আজ প্রায় এক মাস হতে চললো। প্রতিটা দিনক্ষণ নিঃশব্দে গুনে যাচ্ছে ক্যাথেরিন। কবে আবার অফিসে আসবে ইন্দ্র। অফিসটা কেন যেন ওর কাছে আজকাল একঘেঁয়ে লাগে। শুধু একটা মানুষের অনুপস্থিতিতে বদলে গেছে ক্যাথেরিনের যাপিত জীবনের আদল। ক্যাথেরিন বুঝতে পারে একজন মানুষের জন্য অন্য একজনের জীবন বিচিত্রভাবে বদলে যেতে পারে। মাঝে মাঝে ক্যাথেরিনের মনে হয় একজন পুরুষ যেন সত্যিই তার হৃদয়ের অভ্যন্তরে তাকাতে সমর্থ হয়েছে। অফিস শেষে বাসায় ফিরলেও এক ধরনের অস্বস্তি মনের কোনে সব সময় বাসা বেঁধে থাকে। রাতে ইনসোমনিয়া। এ যেন নিরন্তর নির্ঘুম। গত ক'দিন যাবত একটা স্বপ্ন ও ঘুরে-ফিরে দেখছে। আবছা আবছা একটা পুরুষের ছায়া বারবার ওর পাশ দিয়ে চলে যায়। শত চেষ্টা করেও ক্যাথেরিন ঐ মানুষটার মুখটা দেখতে পায় না। এক অজানা শিহরণে বারবার ওর ঘুম ভেঙ্গে যায়। ক্যাথেরিন বুঝে এ শিহরণটা শুধুই ভাললাগার, কখনও ভালবাসার নয়। এ এক নিতান্ত ব্যক্তিগত নিভৃত ভাললাগার প্রতিচ্ছবি। এই গোপনীয়তা কস্মিনকালেও কারো কাছে প্রকাশ করা যাবে না। ইন্দ্রনীলকে ভালবাসা সামাজিক কোন ব্যাকরণেই শুদ্ধ নয়। তবু কেন যেন শুধু ইন্দ্রনীলের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতে চায় ক্যাথেরিনের সমস্ত দেহ-মন। মনের দীঘির শান্ত স্রোতহীন জলে একটি কচি কোমল শালুক বারবার ফুটে উঠতে চায়, যার নাম ইন্দ্র। এই নষ্টালজিয়া আর যেন ক্যাথেরিনের পিছু ছাড়ে না।

ক'দিন পর সকালে অফিসে যেয়েই ক্যাথেরিন শুনলো আজ ইন্দ্রনীল অফিসে জয়েন করেছে। কথাটা শোনা মাত্রই কৃষ্ণনীল জলের রং হঠাৎ বদলে গেল। অফিস আর আজকাল একঘেঁয়ে লাগে না। যেতে-আসতে বারবার ও ইন্দ্রনীলের অফিসের দিকে তাকায়। বারবার ইচ্ছে করে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে কেমন কাটিয়ে আসলো বৌ-বাচ্চা নিয়ে নিজ দেশে। ইচ্ছে থাকলেও এর উপায় ছিল না। বিদেশী অফিসে একান্ত ব্যক্তিগত এরূপ ঠুনকো আলাপ কেউ পাত্তাই দিতে চায় না। তাই সামান্য হাই হ্যালোর মধ্যেই কেটে গেল অনেক দিন।

যা ক্যাথেরিনের মনের জন্য ছিল এক ধরনের নীরব অত্যাচার।

সেদিন সকাল ন'টার দিকে ডাক্তার নাহার আর ক্যাথেরিন একত্রে কফি খাচ্ছিল নাহারের রুমে। সে সময়ই দুঃসংবাদটা বয়ে নিয়ে এলো সঞ্চিতা ম্যাডাম।

–জান নাহার, ইন্দ্র স্যার না গতকাল বিকেলে কার অ্যাক্সিডেন্ট করেছে।

অস্ফুট আর্তনাদের মতো ক্যাথেরিন বলে উঠে,

–কি বলেন। এখন কোথায় আছে!

–হাসপাতালে। তবে আঘাত তেমন মারাত্মক নয়। শুধু ডান হাতের একটা হাড় ভেঙ্গে গেছে।

ডাক্তার নাহার বললো,

–বিদেশ-বিভূঁইয়ে বেচারার এখন কি অবস্থা হবে বলতো?

–সঞ্চিতা বললো তাতে কি, অফিস সব ম্যানেজ করবে। আমরা সবাই মিলে স্যারকে দেখতে যাবো সকাল সাড়ে দশটার দিকে।

ডিরেক্টর মিস্টার পিটার, চীফ কো অর্ডিনেটর মিস্টার হেনরী, ম্যানেজার এরিক গোমেজ, সঞ্চিতা, নাহার সবাই গেল হাসপাতালে ঠিক সময়মতো। শুধু গেল না ক্যাথেরিন। সঞ্চিতা বারবার যেতে বলেছিল ওদের সাথে, কিন্তু মনগড়া অজুহাত খাড়া করে ক্যাথেরিন ব্যাপারটা এড়িয়ে গেল। যেন ইন্দ্রনীলের অসুখের সময় ওর হাসপাতালে যাওয়াটা অতি আবশ্যক নয়। হাসপাতালে হ্যালো করে সবাই অফিসে ফিরে এলো এক ঘণ্টা পরেই। ক্যাথেরিন জানলো চোট খুব মারাত্মক নয়। দু'সপ্তাহ পরেই ইন্দ্রনীল অফিস করতে পারবে।

দুপুর দেড়টার দিকে হাসপাতালের বেডে একা শুয়ে আছে ইন্দ্রনীল। দুপুরের লাঞ্চ চলে এসেছে। অফিস থেকে দুজন পিয়ন চব্বিশ ঘণ্টার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে ওর দেখা-শোনার জন্য। রোগীর যত্নে এতটুকু খুঁত রাখেনি অফিস। হঠাৎ করেই দরজায় নক।

–মে আই কাম ইন স্যার।

এই কণ্ঠ ইন্দ্রনীলের অতি চেনা। চোখের নিমেষে ক্যাথেরিন এসে দাঁড়ায় ওর বেডের পাশে। স্বপ্নের নারী যখন মূর্ত রূপ নিয়ে দু'চোখের সামনে আচম্বিতে এসে দাঁড়ায়, তখন প্রত্যেক পুরুষেরই শারীরিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়। ব্যতিক্রম নেই কোথাও। ইন্দ্রনীলেরও একই অবস্থা। বারবার ইন্দ্র কথার খেই হারিয়ে ফেলছিল। বাক্যবিন্যাস হয়ে যেতে চাইলো আগোছালো।

–স্যার আমি কিন্তু আপনার লাঞ্চ নিয়ে এসেছি। এখনও খান নিতো?

–না

–ভাগ্যিস ঠিক সময় মতো এসেছি। তা না হলে তো পন্ডশ্রম হতো। উহ্ কতো কষ্ট করে আপনার জন্য নির্ভেজাল বাঙ্গালি খাবার এনেছি।

–কষ্টটা করতে বললো কে?

–সব কিছু বলে দিতে হয় নাকি। উপজাচক হয়েও মানুষের কিছু কিছু কাজ করতে হয়। ও নিয়ে আপনার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আমি লাঞ্চ তৈরী করে দিচ্ছি, আপনি খান। আপনার না লবস্টার খুব পছন্দ। কিনে এনেছি, খান।

–আপনি খাবেন না?

–না স্যার, আপনি খান। আমি দেখি।

ইন্দ্রনীল বাঁ'হাতে চামচ নিয়ে খাবার খেতে চেষ্টা করতেই আচমকা ওর হাত ধরে ফেলে ক্যাথেরিন। ডান হাতে এখন ব্যান্ডেজ। তাই বাঁ হাত ছাড়া আর কোন উপায়ও নেই।

–স্যার বাঁ'হাত দিয়ে খেতে কষ্ট হবে না?

–না কিছুই হবে না।

–তবুও অনাভ্যাস তো।

–তাতে কি?

–স্যার একটা কথা বলি।

–কি?

–যদি কিছু মনে না করেন, আমি হাত দিয়ে আপনাকে খাইয়ে দেই।

–ছি ছি কি বলেন!

–এতে ছি ছি'র কি আছে। আমিতো ডাক্তার। কতোদিন কতো রোগীকে নিজ হাতে খাইয়ে দিয়েছি। তাতে কি আমার কিছু এসে-গেছে। আর আজতো আপনি সত্যিই রোগী।

ক্যাথেরিন মিটিমিটি হেসে টুকরো টুকরো চিকেন আর লবস্টার তুলে দেয় ইন্দ্রনীলের মুখে। ওর মুখের হাসির দিকে অপলক চেয়ে থাকে ইন্দ্র। ইন্দ্র বুঝে হাসি শুধুমাত্র ঠোঁটের অভিব্যক্তি নয়। মনেরও প্রতিবিম্ব। হাসি মানুষের অস্তিত্বের কথা বলে। কেন যেন এক নরম ভালবাসার আবেশ ইন্দ্রনীলকে জড়িয়ে রাখতে চায়। ইন্দ্রকে নিজ হাতে খাইয়ে দিয়ে ক্যাথেরিন চলে যায় নিজ ঘরে। যাওয়ার আগে বলে গেছে, রাতেও ডিনার নিয়ে আসবে।

বাসায় ফিরেও ক্যাথেরিনের ভাল লাগে না। কেন যেন এই বিদেশীটার জন্য এক ধরনের মায়া ধরে গেছে। নিজ হাতে খাইয়ে দেয়ার কথাটা মনে করে একাই মুচকি হাসলো ও। ডাক্তার বলে ইন্দ্রনীল তাতে রাজী হয়েছে। ডাক্তার তার রোগীকে নিজ হাতে খাইয়ে দিতে পারে। এটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যতোদূর স্মৃতি যায় ক্যাথেরিন হাতড়িয়ে দেখলো, কোন রোগীকে নিজ হাতে খাইয়ে দিয়েছে এমন কোন ঘটনা ওর মনে পড়লো না।

ইন্দ্রকে আজ দেখার পর থেকেই ওর বুকের ভেতর শুরু হয়েছে নিজেকে হারানো আর খুঁজে পাওয়ার এক গোপন প্রক্রিয়া। এক অদ্ভুত ঘোর ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখে। এ কিসের মায়া, কিসের ঘোর, কি ধরনের আবেশ– ও যেন ঠিক ঠাহর করতে পারে না।

রাত ন'টা নাগাদ ডিনার নিয়ে ক্যাথেরিন ইন্দ্রনীলের হাসপাতালে এলো। তারপর সেই দুপুরের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। যেন ইন্দ্রনীলের নিজ হাতে খাওয়ার আর দরকার নেই। ডান হাতটায় ব্যান্ডেজটা আজীবন থাকলেও চলবে। ক্যাথেরিন হঠাৎ বললো–

–স্যার আগামী সপ্তাহ আমি অফিস থেকে ছুটি নিয়েছি।

–হঠাৎ ছুটি কেন?

–অফিস জানে আমার সাংসারিক কাজকর্মের জন্য ছুটি। তবে আসল ব্যাপারটা তা নয়।

–আসল ব্যাপার কি?

–আপনার ডাক্তার বললো আরো দিন সাতেক আপনাকে হাসপাতালে থাকতে হবে। তাই আপনার দেখা-শোনার জন্য এ ছুটি। পূরোদিন অফিস করে দুবেলা আসা-যাওয়া করা যাবে না।

–আপনি কি পাগল?

–এতে পাগলামির কি আছে। আপনি আমাদের অতিথি। রিটা বৌদি এখানে নেই। আমাদের একটা দায়িত্ব আছে না?

–কথাটা কি আমাদের– না আমার।

–ঐ একই কথা হলো। রিটা বৌদির পুরো প্রক্সিতো আর দিতে পারবো না, যতোটুকু পারি তাতো দেই।

কথাগুলো বলে ক্যাথেরিন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ইন্দ্রনীলের মুখের দিকে। ইন্দ্রর মুখে মারকারী বাতির আলতো আভা। সবচেয়ে আশ্চর্য ওর চোখ দুটো। দীর্ঘায়ত নয়ন, তাতে অসাধারণ দীপ্তির আভা। কেন যেন মনে হয় কোনদিন দ্যাখেনি ও পুরুষের এতো সুন্দর মায়াবী চোখ। ক্যাথেরিন টেরই পায়নি কখন ইন্দ্রনীলের বাঁ হাতটা ওর ডান হাতটাকে ছুঁয়ে আছে। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পায় ক্যাথেরিন।

–স্যার আমি আজ যাই। কাল দুপুরে আসবো।

–আসার দরকার নেই তো। খাবার পাঠিয়ে দিলেই চলবে।

–স্যার একটা কথা বলি।

–কি?

–আমি নিজের ইচ্ছায় আসবো আবার নিজের ইচ্ছায় যাবো। এই শর্তটা মনে থাকে যেন। আমি খুব ডমেনেটিভ মেয়ে। তাই যা বলি তাই শুনতে হবে।

ইন্দ্রনীলের মুখে রা সরে না। এ যেন একটি নারীর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। যতোক্ষণ ক্যাথেরিন থাকে ততোক্ষণ হাতে ব্যথা থাকে না। ক্যাথেরিন চলে গেলেই ব্যান্ডেজের ভেতর ভাঙ্গা জায়গাটা শিরশির করতে থাকে। ডায়াজাপামের ডাবল ডোজ খেয়ে ইন্দ্র ঘুমাতে চেষ্টা করে। তবু ঘুম আসে না। আবার আলো জ্বেলে পড়তে থাকে ডাফনি মার্কিনের লেখা। Loneliness is a terrific thing but you can always cure it and when I am sad you are always there to tell me I will be fine. ইন্দ্রনীল যন্ত্রচালিতের মতো একাই বলে উঠে–

–কে আমাকে এতো রাতে এ কথাটা বললে বলো?

ইন্দ্রনীল যে ক্যাথেরিনকে ভালবাসে তা ক্যাথেরিন টের পায়। কারণ ও নারী। পুরুষের চোখের ভাষা ও বুঝে। জীবন যাপনের এই প্রবহমান স্রোতে কখন যে ভালবাসার আচমকা জোয়ার লাগে তা কে জানে? এ পৃথিবীর কিছু সম্পর্ক জন্ম থেকে হয় আর কিছু হয় জন্মের পর। দ্বিতীয় সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি বড়ো বেয়ারা। সামাজিক ব্যাকরণে যেসব সম্পর্ক অনৈতিক, সে রকম কিছু ঘটলেই সমাজ সংসারের অমোঘ তর্জনী এসে পথ রোধ করে দাঁড়ায়। কিন্তু দু'টি মনের নিভৃত চাওয়া-পাওয়ার মাঝে কি সেই সামাজিক অনুশাসন কখনও সীমারেখা টানতে পারে?

রাতে যখন ক্যাথেরিন নিজ ঘরে বসে থাকে গভীর তন্ময়তায় তখনও ভালবাসার বুদবুদ শুনে মনের জলাশয়ে। রাতে প্রায়শঃ ঘুম আসে না। ইনসোমনিয়া– কোন ঘুমের ওষুধই তেমনভাবে কাজ করে না। গভীর রাতে সত্তা থেকে নিদ্রা মুছে যায়। দুচোখের ওপর ভর করে এক নিভৃত ছায়া। এই নিভৃত ছায়া ঘরময় পায়চারি করে ওকে জাগিয়ে রাখে সারারাত। রাত শেষের প্রথম অস্ফুট আলো যখন আকাশকে স্পর্শ করে তখনও ক্যাথেরিন জেগেই থাকে। অনূদিত সূর্যের পানে তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে চেয়ে থেকেও আপন মনে বলতে থাকে– আমার মনের দীন মন্দিরে পথ ভুলে তুমি এসেছ কেন দেবদূত? আমি তোমার ভালবাসাকে বরণও করতে পারি, বর্জনও

করতে পারি– এ অধিকার আমার আছে। কিন্তু তোমার ভালবাসাকে উপেক্ষা করি ক্যামনে? আমার অন্তর তিমিরে তুমি বারবার জ্বালো ভালবাসার দীপ। ন্যায়-অন্যায় বোধ এখন একেবারেই তিরোহিত। এ ভালবাসা কখনও অন্যায় নয় প্রভূ।

হঠাৎ করেই আধো ঘুম, আধো জাগা ভাবটা কেটে যায়। ইদানীং বারবার এসব অসংলগ্ন ভাবনাগুলো মনে আসছে। ক্যাথেরিন বুঝতে পারে না এ কি ভালবাসা, না আবেগতাড়িত ম্যানিয়া। একটি অসম সখ্যতা, বন্ধুত্ব, ভালবাসা আর আকর্ষণ ওকে তাড়িত করে অহর্নিশি।

সকালে ঘুম থেকে উঠার পর ইন্দ্রনীলের যেন সময় কাটতে চায় না। ন'টা নাগাদ ডাক্তারের রুটিন মাফিক ভিজিট। তারপর শুধু অবসর। সারাটা সকাল নানা চ্যানেল পাল্টিয়ে টিভি দ্যাখা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। ঘড়ির দিকে তাকালে মনে হয় ঘন্টার কাঁটাটা পক্ষাঘাতে ভুলছে। একেবারেই চলৎশক্তিহীন। কিন্তু ক্যাথেরিন কাছে থাকলেই তার উল্টো। কখন সময় গড়িয়ে যায় টেরই পাওয়া যায় না। প্রতিদিন ক্যাথেরিন আসে দুবার। একটার দিকে লাঞ্চ নিয়ে আর রাতে ডিনার হাতে।

আজও ক্যাথেরিন এলো একটা নাগাদ। লাঞ্চের পরে দুজন পাশাপাশি বসে খুনসুটি চলে রোজ বিকেল চারটা নাগাদ। ভাললাগা, শিহরণ, অকারণ হাসি আর কটাক্ষে চলে যায় সময়ের পল-উপপল। ইন্দ্রনীল অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ক্যাথেরিনের মুখের দিকে। এই বিকেলে ওর মুখে একটা অদ্ভুত লালচে আভা যা চিবুক থেকে কপাল অব্দি বিস্তৃত। কালো টিউলিপের মতন দুচোখের তারা। আয়ত দু-নীল চোখে অপার মুগ্ধতা। ওদের দুজনেরই মাঝে মাঝে মনে হয় ওরা বোধহয় একসাথে একে অপরের কাছে প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে। দুজনের মধ্যে চলে নারী-পুরুষের যথার্থই অতি গভীর সংযত নিঃশব্দ প্রীতির লীলা। ঘনিষ্ঠতার নানাবিধ বন্ধনগুলো দুজনকেই যেন জড়িয়ে ফেলছে ক্রমশ। ক্যাথেরিন প্রায়শ্চ নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে ওর মনে হয় যত্ন ও কর্তব্য এক, ভালবাসা আর এক। অন্যদিকে ইন্দ্রনীল পুরুষ, তাই ঈষৎ বেপরোয়া। একদিকে আদর্শবাদী আর অন্যদিকে রোমান্টিক। অসম সহাবস্থান একই অন্তরে। ওর ধারণা, খাঁটি সুন্দর ভালবাসা একদিন দুজনকে স্পর্শ করবেই।

এ ক'দিন ইন্দ্রনীলের ডান হাতে ব্যান্ডেজ ছিল। আজ পাঁচদিন পর চেক এক্স-রে করা হয়েছে। ডাক্তার বলেছে হাতের অবস্থা ভাল। কাল সকালেই ব্যান্ডেজ খুলে দিবে। পরশু ছুটি।

–স্যার, কাল দুপুর থেকে তো আপনাকে আর আমার খাইয়ে দিতে হবে না।

–অবশ্যই। আপনি কি চান আমি সারাজীবন আপনার হাতে খাবো?

–হ্যা আমি তো তাই চাই।

ক্যাথেরিনের এ ধরনের স্পষ্ট উত্তরে ইন্দ্রনীল যুগপৎ আনন্দিত ও বিস্মিত হয়। কি অদ্ভুত কনফেসন। তবে কি সত্যিই ক্যাথেরিন তাকে ভালবেসে ফেলেছে। ক্যাথেরিন কথাটা বলেই একেবারে চুপসে যায়। ও বুঝতে পারে জিহবার আল ফসকে একটা বেফাঁস কথা বের হয়ে গেছে। কথাতো রিভলভারের গুলীর মতো, একবার বের হয়ে গেলে তাতো আর ফের ব্যারেলে ফিরিয়ে নেয়া যাবে না। ব্যাপারটা স্বাভাবিক করতে ক্যাথেরিন বলে–

–স্যার, কাল রাত থেকে আমার ছুটি।

–হ্যা তাই। আপনি বাঁচলেন।

–স্যার, আপনি এতো রুঢ় কেন? আমার অসুখ হলে আপনি এমন করবেন না, না একবার হাসপাতালে এসে হ্যালো বলেই কর্তব্য শেষ।

ইন্দ্রনীল শুধু ফ্যালফ্যাল করে ক্যাথেরিনের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কোন প্রতিউত্তর দেয় না।

সাতটা দিন ভালই কেটেছিল ইন্দ্রনীলের হাসপাতালে। হাতের আঘাতটা মনের আঘাতে প্রলেপ দিয়ে দিয়েছে।

আকস্মিক এই দুর্ঘটনাটাকে সে আর দুর্ঘটনা ভাবতে নারাজ। কেন যেন মনে হয় এই ছোট্ট দুর্ঘটনাটিই অজানারে জানার সুযোগ করে দিয়েছে। হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়েই ইন্দ্র অফিসে জয়েন করতে চাইছিল। কিন্তু ডিরেক্টর পিটার আরো দু'সপ্তাহ ছুটিতে থাকতে বলেছে। বলা যায় বাধ্যতামূলক ছুটি। অফিসে না গেলে ক্যাথেরিনকে এক নজর দেখারও উপায় নেই। এই পনেরটা দিন কাটাতে হবে অতি কষ্টে।

দশটা দিন বাসায় বসে বসে কাটাতে কাটাতে ইন্দ্র যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল। হাতে এখন ব্যান্ডেজও নেই, ব্যথাও নেই। ডান হাত দিয়ে লেখালেখিও করা যায় অনায়াশে। পঁচিশে মে ঘুম থেকে উঠেই ইন্দ্রনীলের মনটা ঘন কুয়াশায় ভরে গেল। আজ ওর জন্মদিন। গতকাল রাতে রিটা আর অন্টি তাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছে। মা আর মেয়ে মিলে কতো কি করতো যদি কাছে থাকতো। এই বিদেশ-বিভূঁইয়ে একা একা কাটাতে হবে এতো সুখের দিনটা।

দুপুর তিনটার দিকে লাঞ্চ সেরে ইন্দ্রনীল পেপারটাতে চোখ বুলাচ্ছিল অবিন্যস্তভাবে। হঠাৎ কাজের ছেলেটা একটা চিঠি দিয়ে গেল ইন্দ্রকে। একজন ভদ্রমহিলা নাকি চিঠিটা দিয়েই চলে গেছে। একটুও দেরি করেনি।

এমন একটা কার্ডের প্রতীক্ষায় ইন্দ্রনীল কখনো ছিল না। এদেশে কেউ ওর জন্মদিনটা জানে, এটা ওর ধারণায় ছিল না। কার্ড খোলা মাত্রই অপার বিস্ময়। ক্যাথেরিনের দেয়া জন্মদিনের শুভেচ্ছা। গোটা গোটা করে লেখা– এরকম আরো একশ'টা জন্মদিন আসুক। ক্যাথেরিন কি করে জন্মদিনের তারিখ জানলো তা ইন্দ্রনীল কোনমতেই বুঝতে পারে না। কার্ডের ভেতর তিনটি একশ' ডলারের নোট। পাশে ছোট্ট কাগজে লেখা তিন-চারটে লাইন। টাকাটা দিলাম। নিজের ইচ্ছেমতো কিনতে পারেন যা খুশী তাই। সিল্কের জামা, জর্জেটের প্যান্ট অথবা নাইলনের মোজা। কিন্তু কিনতে হবে। টাকা যদি আরো লাগে আরো দেব। তবে তা ক্যাশমেমো দেখানো সাপেক্ষে। তবে প্লিজ টাকাটা মেরে দেবেন না। ইচ্ছে ছিল নিজ হাতে খাইয়ে দেই আজ এই শুভ দিনে। কিন্তু আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া যা মুশকিল। তাই আপাতত সে চিন্তা বাদ দিলাম। তবুও যদি.....। চিঠিটার নীচেই মোবাইল নম্বর।

প্রায় এক ঘন্টা দোনামোনা করে ইন্দ্রনীল ফোন করে ক্যাথেরিনকে।

–আপনি এখন কোথায়?

–স্যার আমি আকাশেও নেই, বাতাসেও নেই, এমনকি মাটিতেও নেই। –এতোক্ষণ শুধু আপনার ফোনের অপেক্ষাতেই ছিলাম। এখন দেখতে হবে, আমি এখন কোথায়।

–ধেৎ কি যে বলেন না।

–সত্যি বলছি স্যার। এতোক্ষণ লাগলো একটা ফোন করতে। এক ঘন্টা। মোবাইলের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে চোখে ছানি পড়ে যাওয়ার জোগাড়।

–আমি দেখা করবো?

–কোথায় যেতে হবে?

–সোনারগাঁওয়ের কাফে বাজার অথবা শেরাটনের বীথিকাতে।

–না পছন্দ হচ্ছে না।

–অফিসে, আমার অথবা আপনার ঘরে।

–অসম্ভব।

–তবে কোথায়?

–কেন স্যার, আপনার বাসায় কি অনেক মানুষ?

–এখানে তো কেউ নেই। আমি একা।

–আমি এলে কি আপনার প্রাইভেসি নষ্ট হয়ে যাবে?

–না....তা....ঠিক না।

–আমি এক্ষুণি আসছি। আপনি কি ভাবলেন তাতে আমার কিছু আসে-যায় না।

পনের মিনিটের ভেতর নিজে ড্রাইভ করে ক্যাথেরিন পৌঁছে যায় ইন্দ্রনীলের বাসায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ইন্দ্রনীল দ্যাখে লাল টুকটুকে ল্যান্সারটা ঢুকছে তার বাসায়। ঐ গাড়ীটার ভেতর স্টিয়ারিং-এ বসে আছে তার আদরের সাদা পাখী। পড়নে কালো রং-এর সালোয়ার-কামিজ।

নিমিশে ক্যাথেরিন এসে হাজির হয় ইন্দ্রনীলের সামনে। সুন্দর একহারা চেহারার ক্যাথেরিনকে ইন্দ্রনীলের বেশ লাগে। ভালবাসার মধুতে জড়ানো ওর চোখমুখ। দীঘির জলের মতো টলটলে দুচোখ, সে চোখের দৃষ্টিতে আজ ব্যক্তিত্বের তীক্ষ্ণতা অতিশয় ক্ষীণ।

হঠাৎ করেই ক্যাথেরিন বললো–

–এ ঘরে কি আরো কোন মেয়ে মানুষ আসে নাকি?

–এ ধারণা আপনার কি করে হলো?

–পুরুষ মানুষের ঘর তো আরও আগোছালো থাকার কথা। সবকিছু এতো টিপটপ হলো কি করে? তাইতো সন্দেহ হচ্ছে।

–আপনি কি এগুলো বলার জন্যই এখানে এসেছেন?

–মোটেই না। আমি যা বলার জন্য এসেছি তা এক্ষুণি বলবো। সরি স্যার।

পাশাপাশি দুজন। ক্যাথেরিন আর ইন্দ্রনীল। ভাললাগার শিহরণে চলে যায় সময়ের পল-উপপল। ভাললাগার ঘোর ক্রমশ দুজনকেই যেন একটা জ্যোৎস্নার দিকে নিয়ে যায়। একজন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অন্যজনের মুখের দিকে। ক্যাথেরিনের স্বপ্নালু দুচোখের অতল জলের আহবান ইন্দ্রকে কেন যেন বারবার টেনে নিয়ে যেতে চায় অচেনা গন্তব্যে। ক্যাথেরিন চেয়ে থাকে ইন্দ্রনীলের দিকে। ইন্দ্রনীলের দুচোখে ভালবাসা, সাহস আর একাগ্রতা মিলেমিশে যেন একাকার। কখন যে ক্যাথেরিনের বাড়িয়ে দেয়া দুহাত চলে গেছে ইন্দ্রনীলের দু'হাতের খোঁপে তা ক্যাথেরিন টেরই পায়নি। ঘামে সিক্ত হয়ে নরম হয়ে যায় দুজনের হাতের তালু। একজনের হাত অপরকে জড়িয়ে রাখে ঘন্টার পর ঘন্টা। এ যেন ঠোঁটে ঠোঁট নয়, হাতে হাতে অনন্ত চুম্বন।

সামনের টেবিলে নানা রকম স্ন্যাক্স। ক্যাথেরিন আজ এ ঘরে অতিথি। ইন্দ্র এক পিস কেক নিজ হাতে তুলে দ্যায় ক্যাথেরিনের মুখে।

–মুখে তুলে দিতে হবে না। আমি নিজ হাতে খাবো।

–কেন খাইয়ে দিলে কি অসুবিধা? আমাকে যে আপনি হাসপাতালে রোজ খাওয়াতেন।

–ওর জন্য নয় স্যার। ভয় লাগে কখন আপনার আঙ্গুলে কামড় লাগে।

–কেন আপনি এতোবার আমাকে খাওয়ালেন, আমি কি একবারও আঙ্গুলে কামড় দিয়েছি।

–বার তিনেক তো দিয়েছেনই।

–ধেৎ একদম বাজে কথা। আমি কক্ষণও আপনার হাতে কামড় দেইনি। একজনের আঙ্গুলে কামড় দেব। আর তা টেরই পাবো না, তা কি হয়?

–কি করে বুঝবেন? আপনি তো ভেবেছেন চিকেন কিংবা মাটনের হাড়ে কামড় দিচ্ছেন। যে কামড়টা খায় সেই শুধু বুঝে। যে দ্যায় সে কি তার ব্যথা বুঝে?

আগোছালো খুনসুটিতে কেটে যায় চার ঘন্টা। কখন যে সময় পেরিয়ে গেল দুজনের কেউ তা টেরই পেল না। এবার ফেরার পালা। যাবার বেলা ক্যাথেরিন একটুকরা মিষ্টি খাইয়ে দিতে চায় ইন্দ্রকে। ইন্দ্র খেতে চায় না।

–আমার একদম খিদে নেই এখন। পেট ভরা, এতটুকু জায়গা নেই।

–ঠিক আছে, যা খেলে পেট ভরে না তাই না হয় খান।

ক্যাথেরিনের চোখে-মুখে দুষ্টামীর হাসি। এরকম হেয়ালির মর্মকথা বুঝতে ইন্দ্রনীল যেন যথার্থই ব্যর্থ হয়।

ক'দিন পর দুজনে আবার যথারীতি অফিসে। যে ক'দিন ইন্দ্র ছুটিতে ছিল প্রতিদিন ক্যাথেরিন অন্তত একবার ফোন করেছে। সেদিন সকাল দশটার দিকে ক্যাথেরিন এলো ইন্দ্রনীলের অফিসে। হাতে একটা ছোট্ট খাম। ওটি দিয়েই ক্যাথেরিন তরতর করে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। খামের ভেতর ছোট্ট চিরকুট। তাতে লেখা আপনি কি আন-রোমান্টিক, না মেয়েদের মন বুঝেন না। Did I forget to tell you I love you? চিঠির নীচে গোটা গোটা করে লেখা, আজ সাড়ে পাঁচটার সময় আপনার বাসায় যাবো। থাকবেন কিন্তু। আর একটা কথা, সম্পর্কটা কবে আপনি থেকে তুমিতে নামবে। না তা নামার দরকার নেই? শ্রদ্ধায় বিনয় থাকে, কখনও ভালবাসা থাকে না। এ কথাটা বুঝেন না? না সব দায় আমার? আপনার কিছুই করার নেই।

ঠিক সন্ধ্যার আগখানে ক্যাথেরিন পৌঁছে যায় ইন্দ্রনীলের বাসায়। পরনে ফিনফিনে শিফনের শাড়ী। ওর চোখের তারা দুটি এই মুহূর্তে অতি জ্বলজ্বলে। কপালে খুচড়ো চুলের উড়উড়ানি। তার ভেতর দিয়ে ঈষৎ কুঞ্চিত কপালটি স্পষ্ট দ্যাখা যায়।

–তোমার জন্য ঠায় জানালার কাছে বসে আছি আধা ঘন্টা।

–ওমা। তুমি তো আজকে দারুণ স্মার্ট। আমাকে আপনি থেকে তুমি বলতে কতোক্ষণ আয়নার সামনে কসরৎ করেছ- বলতো?

–ধেৎ বাজে কথা।

ইন্দ্রনীল অপলক চোখে চেয়ে থাকে ক্যাথেরিনের মুখের দিকে। ক্যাথি মুচকি হেসে বলে–

–কি দেখছ অমন হা করে? আমার বয়স পঁয়ত্রিশ পেরিয়ে গেছে অনেক আগেই। এখন কি আর দেখার কিছু অবশিষ্ট আছে?

–তুমি এত রুড কেন?

–আচ্ছা তুমি একটা কথা বলতো। আমি কি সত্যিই সুন্দর, না আমাকে অন্য কারোর মতো লাগে?

–তুমি তোমার মতোই। তুমি অন্য কারোর মতো নও।

–ইন্দ্র, তুমি আমাকে কবে থেকে এতো ভালবাস?

–যেদিন তোমাকে প্রথম দেখেছি সেদিন থেকে।

–বল কি, সে তো এক বছর!

–হ্যা।

–এক বছরের ভালবাসা, এতোদিন লুকিয়ে রাখলে কি করে?

–এক বছর কেন, এক যুগও লুকিয়ে রাখতে পারতাম।

–ওমা, তুমি তো ইলেকট্রিক বয়লারের মতো, ভেতরে ভেতরে বুদবুদ কর, বাইরে একটু শব্দ নেই।

দুজনে ক্রমেই নিবিড় হয়। দূর থেকে দেখলে মনে হয় এদের দুজনের কোন ঘর-বাড়ি নেই, কোথাও আর যেতে হবে না। এমন একটা অনন্তকালের দৃশ্য হয়েই ওরা বসে থাকবে চিরকাল। ইন্দ্র ফিসফিস করে ক্যাথির কানে বলে–

–তুমি আমাকে ভালবাস কেন?

–এ আমার ডেস্টিনি। নিয়তি আমাকে তোমার সাথে বেঁধে দিয়েছে।

দুজনের দৃষ্টির আড়ালে দুজনই ধরা পড়ে যায় একে অপরের কাছে। ইন্দ্রনীলের দুই করতলে বৃষ্টিভেজা শেফালি ফুলের মতো ক্যাথির মুখখানি।

–কি দ্যাখ অমন করে? আমি কিন্তু মরেই যাবো। আমার কিন্তু শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।

বেশি আবেগে দুজনের কথাতেই আর মাত্রা জ্ঞান থাকে না। এ এক স্বর্গীয় অনুভূতির সময়, এক অপরূপ উষ্ণতার সন্ধ্যা। আদর পাওয়ার সময় কোন মেয়ে যখন তার ভালবাসার পুরুষের দিকে তাকায় তখন সেই নারীর মুখ প্রকৃতি এবং ঈশ্বরের মতো সুন্দর দেখায়। যেমনটা এক্ষণে প্রতিভাত ক্যাথির চোখে-মুখে।

কাছাকাছি দুজোড়া ঠোঁট। গাঢ় শ্বাস, ভেতরে কাঁপন, বুকে দ্রিমি দ্রিমি, লজ্জায় ক্যাথির চোখ বোজা, নাড়ীর গতি অতি চঞ্চল, বুকের ঢিপঢিপ শব্দ শোনা যায় বাইরে থেকেও। এখন শুধু একটা গভীর চুমুর অপেক্ষা। ভালবাসার শত-সহস্র পথ পেড়িয়ে ভাললাগার সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে বহুদূর নীহারিকায় যেন পৌঁছেছে ওরা।

ক্রমেই দুজনের নির্জন খুনসুটি অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। অফিসে দুজনেই দারুণ ব্যস্ত। মাঝে মাঝে মনে হয় জীবনের ব্যস্ততা যেন ওদের সম্পর্কের মধ্যে নির্মম দূরত্বের এক সূক্ষ্ম রেখা এঁকে দিয়েছে। মন চাইলেও সম্পর্কের চর্চাগুলো হয়ে উঠে না, যখন তখন। অফিসে রোজ দ্যাখা হয় বার কয়। শুধু হাই-হ্যালোর মধ্যেই থাকে সেই সংলাপ।

৪

ক্যাথি আর ইন্দ্রর জীবন এখন রং-এ রঙ্গিন সুরে শরগরম। এক সময় প্রতিদিনের সূর্য উঠতো একটা দুঃস্বপ্ন নিয়ে। এখন আর তেমনটি নেই ইন্দ্রনীলের যাপিত জীবন। রিটা আর অন্টিকে ছাড়া এ জীবন হয়ে উঠেছিল বিবর্ণ। এখন তা একেবারেই তকতকে সজীব। এ দেশে একবারও রিটা আসবে না। সাফ কথা বলে দিয়েছে। ক'মাস পর পর ওকেই যেতে হয় আমেরিকা। ক্যাথির জীবনও আর আগের মতো নেই। নতুন ছন্দ এসেছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ক্যাথি এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ বোধ করে। ইন্দ্রনীলের একটা চুমুর জন্য ওর দুঠোঁট তিরতির করে কেঁপে ওঠে বারবার।

আজো ছুটির দিনে ক্যাথি এসেছে ইন্দ্রনীলের কাছে। যেমনটা আসে প্রায়শ্চ। কপাল থেকে গোড়ালি অব্দি নিটোল মসৃণতা। ঠোঁটের হাসি আর উড়ন্ত পাখীর পাখার মতো দু'ভুরুর উঠানামা ইন্দ্রনীলের পাঁজর ছুঁয়ে যায়। ওর নিঃশ্বাসে সুগন্ধ আর দৃষ্টিতে মুগ্ধতা। ক্যাথির মুখে বকুনি আর প্রশ্রয় মেশানো পংক্তিমালা। অফিসের বস এখন বুকের ভেতরের মানুষ। একজন আরেকজনের হৃৎপিন্ডের উত্থান-পতন ধ্বনি শুনে অবিরত। ক্যাথির মুখের ক্লোজ-আপে স্থির হয়ে থাকে সুন্দর। দুজনের শরীরের বয়স কেন যেন মনের বয়সের সাথে মিলে না।

–ক্যাথি, তুমি আজ এমন সাজগোজ করেছ না, তোমাকে আজ কসমেটিক কোম্পানীর মডেলদের মতো লাগছে। তোমার সাজগোজ বয়সকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে চাইছে তোমার শরীর থেকে।

–ঢং করো না। তোমার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ আছে।

–সে আবার কি?

–প্রতিদিন অফিসে তোমার কাছে দু'তিন ডজন মেয়ে আসে কেন? ব্যাপারটা কি?

–ধেৎ ওরা ভার্সিটির ডেমোগ্রাফির ছাত্রী। আর রোজতো আসে না। সপ্তাহে দুদিন। এ মাস আসবে। ওরা আসে ব্রিফিং নিতে। অফিসিয়াল প্লেসমেন্ট। তাতে তুমি চটছ কেন?

–চটবো না কেন। আমি তার অ্যাপয়ন্টমেন্ট পাই না। আর কোথা থেকে কারা এসে তার চারপাশে ঘুরঘুর করছে। ঐসব ক্লাসফ্লাস বাদ দাও।

–তুমি কি আমাকে সন্দেহ কর?

––করিই তো– একবার না একশ' বার।

–তার মানে।

–তোমাকে যেদিন অফিসে প্রথম দেখেছি সেদিনই বুঝেছি তুমি অনেক দরজায় ধাক্কা দিয়ে এদেশে এসেছ।

–আমিও বুঝেছি।

–কি বুঝেছ বল?

–না বলবো না।

–না এক্ষুণি বলো।

–আমিও যেদিন প্রথম তোমাকে দেখেছি সেদিনই বুঝেছি তুমি এক ঘাটে নোঙ্গর করার মতো মেয়ে না।

–এই শয়তান। পেট ভরা কুবুদ্ধি। শুধু কথার পিঠে কথা বানায়। তুমি তোমার কথা উইথড্র কর।

–তুমি তোমার কথা আগে উইথড্র কর।

–করলাম

–শুধু ও করলে হবে না। বাজে কথাটা তুমি আগে বলেছ। একটা চুমু খাও।

কিশোরী মেয়েদের মতো রাগ করে ক্যাথি বলে–

–কতোক্ষণের চুমু।

–দশ মিনিট।

–না এক ঘন্টা খাই।

দুজনেই একসাথে হেসে উঠে খিলখিল করে। দুজনের উষ্ণ শ্বাস-প্রশ্বাস মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। একজনের মুখে আরেকজনের ভেজা ভেজা ভারী শ্বাস। কতোক্ষণ পরে ক্যাথি চলে যায় আপন বলয়ে। দুঠোঁটে সেঁটে থাকে চুমুর শিরশিরানি। রোজ ক্যাথি এভাবে চলে যায় ইন্দ্রনীলের কাছ থেকে। শুধু আনন্দোচ্ছ্বাস আর কোমলতার চিহ্ন রেখে যায় ওর বুকের ভেতর।

ক'দিন মহাব্যস্ত ছিল ইন্দ্রনীল অফিসে। দ্যাখা হয়নি দু'তিন সপ্তাহ। বিগড়ে গেছে ক্যাথি। দ্যাখা হতেই এন্তার অভিযোগ।

–ইন্দ্র আমি তোমাকে পুরোটা বুঝতে পারি না। কখনও মনে হয় তুমি খুব রোমান্টিক আবার কখনও মনে হয় তুমি একেবারে রূঢ়।

–তার মানে কি? কখনও রোমান্টিক আবার কখনও বার্মাটিক।

–ধেৎ দুষ্টামী করো না। বলো না তুমি অমন কেন?

–জানো আমি না নদীর পাড়ের বালির মতো।

–সে আবার কি?

–বালির অভিযোজন ক্ষমতা জানো? যতো তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত হয় আবার তেমনি দ্রুততায় আবার ঠান্ডা হয়।

–তোমার সাথে কথায় পারা যাবে না। এই এতো ঠান্ডা আমাকে একটু জড়িয়ে ধরো না। দ্যাখ আমার পাগুলো একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে।

এখানে ভালবাসা এখন অচল, অটল দীপশিখার মতো দীপ্তিময়। দুটি সত্তার অভিনব সম্মিলন। ইন্দ্রনীলের বুকে ক্যাথির উষ্ণ শ্বাস-প্রশ্বাস। ইন্দ্র আলতো করে ডাকে–

–ক্যাথি।

–বল।

–আমি যদি বিরানব্বই সালের আগে ঢাকায় আসতাম তবে কি হতো?

–এখন যা হচ্ছে শুধু তাই হতো। এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।

–কেন তুমি আমাকে বিয়ে করতে না।

–বোকারাম। বিরানব্বইতে তুমি আনম্যারেড ছিলে, কিন্তু তখন আমি কি ছিলাম?

বিরাট একটা ভুল হয়ে গেছে। বিষম ভুল করে লজ্জায় নত হয় ইন্দ্র। ক্যাথির বিয়ে হয়েছে ইন্দ্রনীলেরও পাঁচ বছর আগে। তবু সাহস করে ইন্দ্র বলে–

–যদি তোমার বিয়ের আগে আমাদের দ্যাখা হতো?

–তবুও বিয়ে হতো না।

–কেন?

–তুমি হিন্দু। তোমাকে আমি বিয়ে করতাম না কস্মিনকালেও।

এমন একটা অপ্রিয় সত্য কথা শুনে ইন্দ্র সত্যিই ভড়কে যায়। ইন্দ্র যাগযজ্ঞ জানে না। পূজোপাঠ করে না। এই তার হিন্দুয়ানী। সে জন্মসূত্রে হিন্দু। কিন্তু মননসূত্রে অথবা ক্রিয়াকলাপে নিতান্তই অহিন্দু। ধর্মের সাথে তার কোন মানসিক সম্পর্ক নেই। সে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে প্রগতিশীল নীতিবোধ বিকাশের পথে এটিই আজকের পৃথিবীতে প্রধান প্রতিবন্ধক। ছোটবেলা থেকে ইন্দ্র দেখেছে ওদের ঘরে অসংখ্য দেবদেবীর পাশাপাশি সযত্নে শোভা পেত যিশুর একটা সুন্দর ছবি।

ইন্দ্র রাগ করেছে ক্যাথি তা বুঝতে পারে।

ও প্রাণপণে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে ইন্দ্রকে।

–তুমি রাগ করেছ? আমি অতোশত ভেবে বলিনি।

মানুষের আত্মার চেয়ে সুন্দর আর কিছু নেই। ক্যাথি আর ইন্দ্রনীলের প্রেম। সামাজিকতার সিলেবাসে এ যেন অনৈতিক কিন্তু দুটি আত্মার দিকে চাইলে মনে হয়, এ ভালবাসা একেবারেই অপরিহার্য। এ পৃথিবীতে কোন মানুষ দেবতা নয়। কাউকে অহেতুক দেবতা ভাবারও কোন কারণ নেই। শুধু দুটি নিঃশঙ্ক হৃদয় পরিব্যাপ্ত হয়ে

আসে ভালবাসা। ক্যাথি ফিসফিস করে বলে ইন্দ্রনীলের কানে কানে–

–শো-নো...ই-ন্দ্র। ভালবাসার মানুষকে বিয়ে করতে নেই। বিয়ে করলে ভালবাসা মরে যায়।

কথাটা কতোটা সত্যি তা কে জানে? তবে নারী-পুরুষের স্বামী-স্ত্রীর জীবন একেবারেই উত্তাপহীন। এক ঘরে চলছে দুজন ঠিক যেন সমান্তরাল রেললাইনের মতো। আছে কাছাকাছি কিন্তু এক বিন্দুতে মিলবে না কোনদিন। খুব সম্ভবত বিয়ে মানেই একটা অস্বস্তিকর তিক্ত জীবনের আজীবন ধারাবাহিকতা। মানুষ শুধু ভালবাসা নিঃশেষ করার জন্যই বিয়ে করে।

যাবার বেলা ক্যাথি একটা বাজে খবর দিলো। স্বামীপুত্র নিয়ে ব্যাংকক যাবে আগামী সপ্তাহে। দু'সপ্তাহ দেশে থাকবে না। তাই দেখা-সাক্ষাৎও আপাতত বন্ধ থাকবে ক'দিন। মুহূর্তে মন খারাপ হয়ে যায় ইন্দ্রনীলের। ক্যাথি ইন্দ্রনীলের কপালে হাত রেখে বলে–

–তুমি এমন কেন? মাত্র তো দু'সপ্তাহ। আমি তোমাকে অনেক ছবি দিয়েছি না। আমি যখন থাকবো না রোজ বারবার আমার ছবি দেখবে। হবে না?

এবার ইন্দ্রনীল সত্যিই হেসে দ্যায়।

–ছবি দেখে ভালবাসা হয় নাকি? ওতো একেবারেই থিউরিটিক্যাল প্রেম।

–ও সাহেব, ইদানীং আর থিউরিটিক্যাল ভালবাসায় হচ্ছে না। সবই প্রাকটিক্যাল চাই....না। পাজী।

–তা নয়তো কি? ছবি দেখে ভালবাসা আর কমলালেবুর বদলে ভিটামিন সি খাওয়ার মধ্যে পার্থক্য কৈ। একেবারেই স্বাদহীন।

–ঠিক আছে স্বাদটা একটু ডীপফ্রিজে ভরে রাখ। আমি এলে ফ্রিজ খুলবে।

রাতে প্রায়শ ক্যাথির ঘুম আসে না। মাঝে মাঝেই অপরাধবোধ জেগে ওঠে মনে। কেন যেন মনে হয় স্বামীকে, সংসারকে, সমাজকে নিয়ত ফাকি দিচ্ছে ও। ক্যাথির সাথে তার স্বামীর সম্পর্ক অন্য পাঁচ-দশটা স্বামী-স্ত্রীর মতোই। এ সম্পর্কে কোন উত্থানও নেই, পতনও নেই। প্রতিদিন বিছানায় যায় আরোপিত জীবন-যাপনের জন্য। স্বামী-স্ত্রী মিলন। ব্যাপারটা যেন নিরেট যান্ত্রিকতা। একেবারেই তা নিছক অভ্যাসের মতো। কিন্তু যাবতীয় সত্তা জুড়ে ইন্দ্রনীল। ভালবাসা কি কখনও নীতির অনুশাসন মেনে চলে? সে কি কখনও বসে থাকে কারুর সমর্থনের আশায়। অহল্যা কি করেছে কখনও সমাজের সমর্থনের অপেক্ষা। অথবা লেডি হ্যামিলটন। সমাজ জীবনের কিছু কিছু বেড়া টপকানো অসম্ভব। সহজে তা ডিঙ্গানো যায় না। শুধু ভালবাসার জন্য স্বর্গ ছেড়ে দেবতা নেমে আসে ধরার ধুলায়। এ কি অন্যায়। দান্তে আর বিয়াত্রিসের প্রেম। বিয়াত্রিস স্বর্গবাসিনী অনিন্দ্য সুন্দরী নারী। বিয়াত্রিসের বিয়ে হয়ে যায় অন্যত্র। কিন্তু অনুপমা এই নারী স্বর্গসুখে থেকেও দান্তের কথা ভেবে ব্যাকুল। দান্তের প্রেম তাকে সুদূর স্বর্গেও বিচলিত করতো অহর্নিশি। শুধু প্রেমাস্পদের জন্য বিয়াত্রিস স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নেমে এসেছিল। জন কীটসের এন্ড্রাইমিয়ন পাহাড়ে নিদ্রামগ্ন ছিল। তার রূপে অভিভূত স্বর্গের দেবী সেলেনি। দেবতা-মানুষের দুস্তর ব্যবধান। এন্ড্রাইমিয়নের ওষ্ঠে ওষ্ঠ রাখলো সেলেনি। অমরত্ব লাভ করলো এন্ড্রাইমিয়ন। মিলনের ব্যাকুলতাকে অনুশাসনের ঘেরাটোপের মধ্যে নীল নির্জনে আটকে রাখার যাবতীয় সামাজিক বাধা হলো মুহূর্তে চুর্ণ।

অনুক্ত অবরুদ্ধ হৃদয়াবেগকে সবাই সহজে মেনে নিতে পারে না। তবু চারদিকে নানাবিধ ভয়। কখনও ভয় এসে কণ্ঠ রোধ করে আবার কখনও বা সামাজিক অনুশাসন। কিন্তু অন্তরালের এই অনুতাপ কতোদিন সওয়া যায়? যে মানুষটির চলন বলন, ভ্রূভঙ্গি, কথাবার্তা, দৃষ্টিপাত সব কিছুতেই চুইয়ে আসে বিশাল ভালবাসার হৃদয়াবেগ, তাকে কি করে এড়িয়ে যাওয়া যায়? বারবার হেরে যায় সমাজ ক্যাথির ভালবাসার কাছে। ইন্দ্রনীলের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস সব দিক থেকে ঘিরে ফেলে ক্যাথির যাবতীয় অস্তিত্বকে। তাই ক্যাথির জীবনে চলছে পরকীয়া প্রেম আর গার্হস্থের অসম যুগলবন্দি। ভেঙ্গে ফেলতে ইচ্ছে করে সামাজিক অনুশাসনের সংহিতা।

মোটেই বিবেক স্পর্শ করে না মনের অনুভূতিকে। জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাক পুরনো প্রথার অচলায়তন। মনের মধ্যে অবাধ্য অবশেসন। কারুর কারুর জীবন মস্তিষ্ক দিয়ে পরিচালিত হয় আবার কারুরটা হয় হৃদয় দিয়ে। ক্যাথির জীবন এখন হৃদয় দিয়ে পরিচালিত। ইন্দ্রনীলকে কাছে পাওয়ার ম্যানিয়া পুরু আস্তরে ঢেকে দিয়েছে ওর জীবনের যাবতীয় বিবেচনার উৎসকে। যেন নষ্টালজিয়া আচ্ছন্ন এক যন্ত্রচালিত মানুষ ও।

সাধারণত অফিসে ইন্দ্রনীল খুব একটা ক্যাথেরিনের ঘরে যায় না। আজ সকালে এসে ও সপাট ঢুকে গেল ক্যাথির ঘরে। মুখে জড়িয়ে আছে আলতো হাসি। এই সাত-সকালে ইন্দ্রকে দেখে কিছুটা অবাক হয় ও।

–তুমি অ্যাতো সাত-সকালে?

–কি করবো। তুমি তো আজ-কাল আমার ঘরে যাওয়া ছেড়েই দিয়েছ।

–ধেৎ ছেড়ে দেইনি। ভয় করে তাই যাই না।

–ভয় কেন?

–তোমার পিএস ইয়াসমীন সন্দেহ করবে।

–কি যে বলো না, ইয়াসমীন খুব ভাল মেয়ে।

–ভাল মেয়েরা সন্দেহ করে না? জান সন্দেহবাতিক মেয়েদের মজ্জাগত।

–বাজে কথা।

–মোটেই বাজে কথা না। এক ডজন গোয়েন্দা মরে তবে একজন মেয়ের জন্ম হয়।

এক সাথে দুজনেই হাসে। ইন্দ্রনীল চেয়ে থাকে ক্যাথির মুখের দিকে। ক্যাথির মুখের ডৌলটি কেন জানি আজ একটু বেশি কমনীয় বলে মনে হয়। ব্লাউজের ভি-কাটের ইষৎ নিচে স্পষ্ট রেখায় ফুটে আছে দুটি স্তনের নিটোল ভঙ্গিমা। নীরবতা ভাঙ্গে ইন্দ্রনীল।

–জান এতো সকালে তোমার কাছে কেন এসেছি?

–না তো।

–তুমি নিশ্চয়ই জান। তা না হলে হাসছ কেন?

–এমনিই হাসছি। তুমি কেন এসেছ তা আমি কি করে জানবো?

–আজকের দিনটা তোমার জন্মদিন না?

–ছি ছি তুমি করে জানলে?

তুমিও চোর আমিও চোর। তুমি যেখান থেকে আমার জন্ম-তারিখ বের করেছ, ঠিক ঐখান থেকে আমিও তোমারটা বের করেছি।

–অফিস ডসিয়ার থেকে?

–হ্যা। শোন অনেক কাজ আছে। আমি যাই। অফিস ছুটি হওয়ার পরই তুমি ওখানে চলে যাবে।

–কেন? আজ আমার স্পেশাল একটা দিন। তুমি ছাড়া অন্য কেউতো আমাকে ইনভাইট করতে পারে?

–তা পারে না।

–কেন?

–কারণ আমি ছাড়া তোমার আর কেউ নেই। আর থাকতেও পারে না।

ক্যাথির জন্মদিনে দু'জনেই বসে আছে মিলেমিশে একাকার হয়ে। দূর থেকে দেখলে এখানে একটি মানুষ না দু'টি মানুষ তা বুঝতেই বিভ্রম হয়। পুরো শরীরটা ইন্দ্রনীলের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে আধো শোয়া ভঙ্গিমায় ক্যাথি। ইন্দ্রনীল ওর কানে কানে বলে–

–ক্যাথি তোমার আটত্রিশ বছরের জীবনে সবচেয়ে অবাক করার মতো, সবচেয়ে বিচিত্র কোন জিনিসটা দেখেছো বলতো?

–সত্যি বলবো?

–হ্যাঁ।

–জান ইন্দ্র। গত আটত্রিশ বছরের জীবনে পৃথিবীতে অনেক বিচিত্র জিনিস দেখেছি কিন্তু মানুষের মনের মতো এতো বিচিত্র আর কিছু দেখিনি।

–ওমা গল্প-উপন্যাস লিখবে নাকি?

–পারলে তো লিখতামই। সবার হাত দিয়ে কি আর লেখা আসে?

–চেষ্টা কর

–আচ্ছা ইন্দ্র তুমি কি আমাকে ছাড়া অন্য কোন মেয়েকে কোনদিন ভালোবেসেছ?

–একজন নাকি– অনেক।

– বলো কি! তুমি তাদের কথা মনে করতে পার?

–না। কোনো মেয়ের মুখই আমার মেমোরিতে স্থায়ী হয় না। এমন অনেকের কাছাকাছি এসেছি মনে হয়েছে, সারাজীবন এর মুখের রেখাচিত্র বুকে অটুট থাকবে। কিন্তু থাকেনি। অনেক বিক্ষিপ্ত নাম মনে পড়ে কিন্তু তাদের মুখের আদল আর বুক হাতড়িয়ে খুঁজে পাই না। গ্রীবাটা কেমন ছিল ভাবতে গেলে মুখের আদলটা স্মৃতি থেকে হারিয়ে যায়।

হঠাৎ করেই ক্যাথি কোল থেকে সটান উঠে পড়ে।

–আমি ঔপন্যাসিক, না তুমি। কি সুন্দর বানিয়ে বানিয়ে অবলীলায় গল্প বলে যাচ্ছো যেন সব রিয়েল।

–রিয়েলই তো।

–তোমাকে আমি চিনি না। ভীতুর ডিম। এক বছর লাগিয়ে দিয়েছ শুধু আমাকে ভালোবাস এ কথাটা বলতে। কিচ্ছু পারে না আবার বড় বড় লেকচার। তোমার ওপর আমার অনেক রাগ॥

–কেন– রাগ কেন?

ভালোবাসায় জড়িয়ে আসে ক্যাথির ভাষা। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ক্রমেই দ্রুত হয়। ওর দু'ঠোঁট নেমে আসে ইন্দ্রনীলের ঠোঁটে। অস্ফুট স্বরে বলে,

–কেন রাগ তা বুঝ না। তুমি আমাকে আরো আগে বললে না কেন, আমাকে ভালোবাস। দ্যাখতো তোমার ভুলে একটা বছর আমি তোমার আদর পেলাম না।

কতোক্ষণ যে ওরা একে অপরকে জড়িয়ে থাকে তা কেউ জানে না। সময়ের পল-উপপল চলে যায় আপন গতিতে।

–তোমার জন্মদিনের প্রেজেন্টেশন নেবে না?

–কই দাও।

গিফটটা কাছেই ছিল। ড্রয়ার থেকে বের করে তা তুলে দেয় ক্যাথির হাতে।

–একি এতো ডায়মন্ডের ইয়ারিং। এতো টাকা খরচ করেছ কেন?

–আমার কাছে তোমার অনেক পাওনা আছে না?

–কিভাবে?

–হাসপাতালে এতো দেখাশোনা করলে, তার ভিজিট তো দেয়া হয়নি।

–ও ডাক্তারকে ভিজিট দিচ্ছ।

–হ্যাঁ জানো না। Free Treatment means no treatment. ফি ছাড়া ডাক্তার দেখালে রোগী ভালো হয় না।

ডায়মন্ড ইয়ারিং-এর মানিরিসিটটা ক্যাথি বারবার পড়ে। ইন্দ্রনীল আবার ফেঁসে যায়।

–এই দুষ্টু তুমি বলছ, এই দুল ডাক্তারের ভিজিট। কিন্তু এই রসিদ অনুযায়ী তুমি তো এটা নিউইয়র্ক থেকে কিনেছ তোমার অ্যাক্সিডেন্টের আরো অনেক আগে। তা কেমনে হয়? ও সময় তো তোমার আমার এ রকম সম্পর্ক ছিল না।

–কিন্তু আমি জানতাম এ রকম সম্পর্ক হবে।

–ওমা তুমি তো জ্যোতিষও। কোন বিদ্যা পার না বাবা বল না।

–সব পারি। জুতা সেলাই থেকে চন্ডী পাঠ।

–তুমি এতো দাম দিয়ে এটা কিনলে কেন?

ইন্দ্রনীল ক্যাথির কানের কাছে ফিসফিস করে বলে,

–তোমার বয়স পঞ্চাশ যেদিন হবে, সেই সুবর্ণ জয়ন্তিতে তোমাকে একটা গাড়ী কিনে দেব যদি ....

–আবার যদি কিসের–

–যদি মরে না যাই।

দু'হাত দিয়ে ইন্দ্রনীলের মুখ চেপে ধরে ক্যাথি।

–ধেৎ কি যে অলুক্ষণে কথা বলো না। তুমি মরবে কেন?

–আমার তো আবার হার্ট দুর্বল। হার্ট অ্যাটাক হওয়ার ভয়।

–বাজে কথা। অ্যাই বলো না আমার আটত্রিশ বছর ভাল না পঞ্চাশ বছর ভাল তোমার জন্য।

–পঞ্চাশ বছর।

–কেন?

–আটত্রিশ বছর হলো যৌবনের বুড়াকাল, আর পঞ্চাশ বছর হলো বুড়ার যৌবনকাল। তাই তোমার পঞ্চাশই ভাল।

–কিসব যা তা বলো না। মাথামুন্ডু কিছুই বুঝি না। চল না আমরা দু'জনে আজকের এই সন্ধ্যায় রিকশায় করে সারা ঢাকা শহর ঘুরে বেড়াই।

–কি সাংঘাতিক কথা। কেউ দেখে ফেললে সন্দেহ করবে।

–আরে না, কেউ সন্দেহ করবে না। তোমার সাথে আমাকে কেউ দেখলে ভাববে ছোট ভাইকে নিয়ে বড় আপা অথবা ভাগিনাকে নিয়ে আন্টি মার্কেটিং-এ বেরিয়েছে।

–এর চেয়ে বেশি বললে গলা টিপে মারবো।

–ও ছাড়ো না। শ্বাসকষ্টে মরে যাবো তো।

ক্যাথির মুখ ভেসে থাকে ইন্দ্রনীলের দু'হাতের তালুতে। দু'জনের ঠোঁট-নাক যাবতীয় সব কিছু লীন হয় একে একে। দু'জোড়া ঠোঁট তির তির করে আওড়িয়ে যায় কোমল পেলব অনুভূতির কিছু বর্ণমালা। ফিসফিস করে ইন্দ্রনীল ডাকে–

–ক্যাথি।

–বলো।

–তোমার জন্য আজ একটা দারুণ সুখবর আছে।

–তোমার বুকে মাথা রেখে শুয়ে আছি এর চেয়ে সুখবর আর কি আছে! চুপ থাকতো। আমার ঘুম পাচ্ছে।

–কথাটা শোন।

–বল।

–তোমার তো একটা স্কলারশীপ হয়ে যাচ্ছে।

–সত্যি। কোথায়?

–বোস্টন ইউনিভার্সিটিতে। পাবলিক হেলথে মাস্টার্স।

–তুমি কি করে জানলে?

–আমি জানবো না তো কে জানবে? ক'দিন আগেই মিস্টার পিটার আমাকে বলেছে। এ ক'দিন বলিনি জন্মদিনে তোমাকে সারপ্রাইজ দেব বলে।

–আমি বিদেশ যাবো না।

–কেন?

–তখন তুমি কোথায় থাকবে? তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারবো না।

–তোমার স্কলারশীপ হলে তুমি একটা কাজ করবে।

–কি।

–আমাকেও সাথে নিয়ে যাবে।

–এ তো অসম্ভব।

–তা না হলে বিদেশে যাওয়ার আগে আমাকে মেরে ফেলে যেতে হবে।

–আমি মারবো তোমাকে। ভালোবাসার মানুষকে কেউ কখনও মেরে ফেলে।

–কেন আর্নেস্ট হেমিংওয়ের লেখা পড়োনি।

–কিছুই আমি পড়িনি। তুমিই বলো উনি কি লিখেছেন।

–উনি লিখেছেন– If you love him it is not a sin to kill him.

–এ আমি বিশ্বাস করি না। এসব আজেবাজে কথা বলো না তো। আগে স্কলারশীপ আসুক তারপর দেখা যাবে কি করি? আজেবাজে কথা বলে আমার ইম্পরটেন্ট সময়গুলো মাটি করে দিও নাতো!

পাক্কা দু'ঘন্টা ইন্দ্রনীলের বুকে চোখ বুঁজে শুয়ে থাকে ক্যাথি। যেতে ইচ্ছে করে না। তবু এক সময় ফিরে যায় নিজের ঘরে। যেখানে প্রতিদিন অপেক্ষা করে আরোপিত জীবন।

৫

ডিরেক্টরের রুমে মিস্টার পিটার, চীফ এক্সিকিউটিভ অ্যালেন শেফার্ড আর সাউথ এশিয়ান ব্যুরো চীফ মিস্টার পার্ক একসাথে বসে আলাপ করছিলেন। দু'দিন বাদেই ঢাকায় ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের রিজিওনাল কনফারেন্স। এ অফিস থেকে একজন রিপ্রেজেনটেটিভ পাঠাতে হবে। ডিরেক্টর সরাসরি ইন্দ্রনীলের নাম প্রস্তাব করলেন। সামনে দাঁড়ানো ছিল ক্যাথেরিন। ঠাস করে ও বলে ফেললো,

–স্যার মিস্টার ইন্দ্রনীল তো অসুস্থ।

–ওমা ওর আবার কি হলো?

–খুব সম্ভবত টাইফয়েড। দু'দিন থেকে একশ' দু'তিন জ্বর।

–তবে ও অফিস করছে কেন?

–হ্যাঁ স্যার, আমার মনে হয় ওর বাসায় রেস্ট করা উচিত। আর এতো জ্বর নিয়ে ছুটির দিনে সারাদিন কনফারেন্স করাও ঠিক হবে না।

কথাগুলো বলেই ক্যাথি তাড়াতাড়ি বের হয়ে এলো। সরাসরি যেয়ে ঢুকলো ইন্দ্রনীলের অফিসে। মনোযোগ সহকারে কম্পিউটারের কাজ করছিল ইন্দ্র। কোন রকম ভনিতা ছাড়াই ক্যাথি বললো–

–ইন্দ্র শোন, এখুনি হয়তো ডিরেক্টর স্যার তোমাকে ফোন করবে। তুমি বলবে, তোমার হাই ফিভার এবং তুমি অত্যন্ত অসুস্থ। ডাক্তার বলেছে, এটা টাইফয়েডের পূর্বাভাস।

–তুমি ক্ষেপলে নাকি? আমার তো জ্বরই হয়নি, টাইফয়েড হতে যাবে কেন?

–আমি বলছি তুমি অসুস্থ। সুতরাং অসুস্থ।

ক্যাথি দাঁড়ানো থাকা অবস্থায়ই একটা ফোন এলো। কথোপকথন থেকে ক্যাথি বুঝলো ইন্দ্র ডিরেক্টর স্যারের সাথে কথা বলছে এবং আওড়িয়ে যাচ্ছে ক্যাথির শেখানো বুলি। একটু দূরে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসছে ক্যাথি। রিসিভার রেখে দিতেই ক্যাথি বললো–

–এই তো লক্ষ্মী ছেলের মতো কাজ।

–কিন্তু এতো মহা মিথ্যা কথা।

–ভালোবাসতে গেলে অকপটে মিথ্যা বলতে শিখতে হয়। সবসময় সত্যি কথা বললে প্রেম হয় না।

–কিন্তু কেন?

–তা পরে বলবো। এখন তুমি অসুস্থ।

তর তর করে ক্যাথি বের হয়ে গেল ইন্দ্রনীলের অফিস থেকে। সবাই খোঁজ নিতে এলো একে একে। কোন ডাক্তার দেখানো উচিত, কোন ওষুধ খাওয়া উচিত এ নিয়ে আলোচনা হলো। ভেতরে ভেতরে হাসে ইন্দ্রনীল।

মিস্টার পিটার আদেশ দিয়েছেন জ্বর নিয়ে অফিস করা যাবে না। রেস্ট নিতে হবে বাসায় গিয়ে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কনফারেন্স থেকে নির্বিবাদে বাদ পড়ে গেল ইন্দ্রনীলের নাম। এখন অসুস্থ না হয়েও রেস্ট নিতে যাচ্ছে বাসায়। যাওয়ার আগে এতো কিছু কাণ্ড করার নিহিতার্থ কি তা জানার জন্য ইন্দ্রনীল যায় ক্যাথেরিনের রুমে। ইন্দ্রকে দেখেই খিল খিল করে হেসে ওঠে ক্যাথি।

–কেমন এপ্রিল ফুল করলাম তোমাকে।

–কিন্তু কেন? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?

হইনি। তবে অচিরেই হবো।

–তুমি এসব করলে কেন?

–যা করেছি ভালই করেছি। তোমাকে পরশু আর তারপরের দিন কনফারেন্সে ডিটেইল করে দিচ্ছিল।

–তাতে কি? অনেক টাকা ডিএ পাওয়া যেত।

–শোন, আমার হাজব্যান্ড তিন-চারদিনের জন্য কোরিয়া যাচ্ছে। পরপর দুদিন ছুটি। আমি তোমাকে নিয়ে এক জায়গায় বেড়াতে যাবো।

–ওমা তাই অ্যাতো সব।

–হ্যাগো তাই। উপস্থিত বুদ্ধিটা কাজে লেগে গেলো।

৬

ইন্দ্রনীল নিজেই জানে না ও আজ কোথায় যাচ্ছে। পর পর দু'দিন ছুটি। কনফারেন্সে ডেলিগেট হওয়ার ব্যাপারটা ভেস্তে গেছে ক্যাথির কারসাজিতে। আজ সকালে ক্যাথি নিজেই আসবে ওকে নিতে। সকাল দশটায় ওর আসার কথা। আধা ঘন্টা আগেই রেডি হয়ে ঠায় বসে আছে ইন্দ্র। আজ ঢাকার রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম থাকার ভয় নেই। ছুটির দিনগুলোর সকালটাতে এমনটি হয়। ঘন্টার কাঁটা দশটা না ছুঁতেই সশব্দে ক্যাথি এসে হাজির। ক্যাথেরিন যখন এ বাড়িতে আসে তখন তা দূর থেকেই টের পাওয়া যায়। কারণ ওর আবির্ভাব এবং তিরোধান দুই-ই সমান সরব।

–আমি ঠিক টাইম মতো এসেছি। আমার টাইম বিগবেনের ঘড়ির মতো কখনও স্লো বা ফার্স্ট হয়নি। তুমি রেডিতো?

–আমি রেডি।

–না, তোমার তো আবার রেডি হতে সময় লাগে। মেয়েদের মতো সাজগোজ করার অভ্যাস পুরোমাত্রায়।

–আচ্ছা ক্যাথি, আমরা যাচ্ছি কোথায়?

–সে তোমার জানার দরকার আছে? তুমি আমার সাথে যাচ্ছ এইটুকুই যথেষ্ট।

–তবু।

–তবুও আবার কি! আমাকে তুমি ভয় পাও?

–ধেৎ ভয় পাবো কেন?

–তবে চলতো।

গাড়িতে ড্রাইভার নেই। ক্যাথি নিজেই স্টিয়ারিং-এ। ঢাকার রাস্তা পেরিয়ে ক্যাথি-ইন্দ্রনীলকে নিয়ে গাড়ি চলছে আরিচা রোড ধরে। আজকে যেন ক্যাথেরিনের আবেগের সাগরে সত্যিই জোয়ার এসেছে। স্পিড মিটার তরতর করে বাড়ছে উপরের দিকে। মাঝে মাঝে ক্যাথি আড়চোখে তাকায় ইন্দ্রনীলের দিকে। ক্যাথি সামনের দিকে তাকিয়েই বললো,

–অ্যাতো ঢেলাঢেলা চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে কি দেখছ? ডিসটার্ব করো নাতো।

–আমি কখনও কাউকে ডিসটার্ব করি না।

–না তুমি একেবারে সাধু। ভাজা মাছটা উল্টে খেতেও জান না। অ্যাতো ভাল মানুষ সাজতে হবে না আমার কাছে। আমি তোমাকে হারে হারে চিনি।

হঠাৎ সশব্দে গাড়ীটা ব্রেক করলো। মনে হলো যেন দুমড়ে মুচড়ে পড়ে যাবে ওরা রাস্তার পাশে। দুজনের খুনসুটিতে স্পিড ব্রেকার চোখে পড়েনি। আরেকটু হলেই ইন্দ্রনীল সামনের গ্লাসের সাথে ধাক্কা খেত। খিলখিল করে হেসে ওঠে ক্যাথি।

–তুমি হাসছ?

–হাসবো নাতো কি কাঁদবো।

–অ্যাক্সিডেন্ট তো হয়েই গেছিল।

–হোক। যদি দুজন একসাথে মরে যাই তবে কোন অনুশোচনা নেই। তবে একজন থেকে গেলে পুড়তে হবে সারা জীবন।

ইন্দ্রনীল আর কথা বাড়ায় না। হাইওয়েতেও গাড়ি চালাতে যে ক্যাথি পারঙ্গম তা ও টের পেয়েছে। জানালার স্বচ্ছ কাচ দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে ইন্দ্র। দু'বছর পেরিয়ে গেছে এ দেশে এসেছে। এমন করে আর প্রকৃতিকে দেখা হয়নি। সবুজ মখমলের মতো বিস্তীর্ণ প্রান্তর আবার কখনও সাপের মতো এঁকেবেঁকে পড়ে আছে নদী। দু'দিকেই নদীর বিচিত্র বিস্তার। বিশাল আকাশের সামিয়ানার নিচে এমন জলময় আলপনা কখনও দ্যাখেনি ও।

পাক্কা সাড়ে তিন ঘন্টা গাড়ি চালিয়ে ওরা পৌঁছে গেল হাইওয়ের পাশেই একটা হোটেলে। আহামরি কোনো হোটেল নয়। মেরিয়ট, রিটজ কিংবা ফোর সিজন্স তো নয়ই; নিদেনপক্ষে হলিডে ইন কিংবা হাওয়ার্ড জনসনের সাথেও এর তুলনা করা চলে না। টেনেমেনে দেড় কি দু'স্টার হতে পারে। তবে এটি পর্যটনের মোটেল। ন্যূনতম একটা আভিজাত্য আছে। গাড়ি থেকে নেমেই ওরা দু'জন গেল হোটেল লবিতে। সব যেন ঠিকই করা আছে। কথাবার্তায় বুঝা গেল ঢাকা থেকে রিজার্ভেশন নিয়ে ক্যাথি এখানে এসেছে। কাউন্টারের মেয়েটার সাথে কথা বলার সময় এক পর্যায়ে ক্যাথি বললো।

–আমরা হাজব্যান্ড ওয়াইফ একদিনের জন্য এখানে চেইঞ্জে এসেছি।

ইন্দ্রনীলের গলায় কি যেন হঠাৎ করেই আটকে গেল। ঘটনার আকস্মিকতায় ও একেবারেই বিমূঢ়। ধাতস্থ হতেই সময় কেটে যায় খানিকটা। ও ক্রমেই বুঝতে পারে প্রলয়ংকরী প্রেমিকার হাতে ও আজ নিজেকে সঁপে দিয়েছে। রুমের চাবি নিয়ে ক্যাথি তর তর করে হেঁটে যায় সিঁড়ির দিকে। যেন ইন্দ্র আসছে কি আসছে না

তার দিকে ওর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। মোহাবিষ্টের মতো ইন্দ্র ওকে অনুসরণ করে। আর এই মুহূর্তে ওর এটা না করে কোন উপায়ও নেই। ইন্দ্রনীলের বুকের ভেতর এখন যেন নিরবিচ্ছিন্ন বৃষ্টির শব্দ।

যেভাবে ব্যাপারগুলো ঘটলো তাতে ইন্দ্র একটু ভড়কে গেল। কিন্তু একটু ভয়ের লেশ নেই ক্যাথেরিনের। যেন যা যা ঘটছে তা অতি স্বাভাবিক। তাই ও একেবারেই নিশংক। দুপুরের লাঞ্চে বসেও ইন্দ্র চুপচাপ। চারদিকে টুরিস্টদের কলতান। কেউ রাজনীতি, কেউ বিশ্বকাপ আবার কেউ খুন-খারাবি। শুধু চুপচাপ ওরা দু'জন। দূর থেকে দেখলে মনে হবে এরা দু'জন একদম কেউ কাউকে চিনে না অথবা ওরা দু'জন স্বামী-স্ত্রী যাদের মধ্যে একটা বড় ধরনের খিটিমিটি কাণ্ড ঘটে গেছে গত রাতে। স্যুপ খেতে খেতে আলতো করে ইন্দ্র বললো।

–আমরা কি আজ ঢাকায় ফিরছি না?

–লবিতে কি বললাম, তুমি শোননি?

–বাসায় কি বলে এসেছ?

–যা বলার বলে এসেছি। যাকে নিয়ে ভয় ছিল সে তো বিদেশে। আমার অসুবিধা নেই। রাতে তুমি ফোন করে দিও তোমার কেয়ারটেকারকে।

সাইট সিয়িং, নৌকা ভ্রমণ, ধান খেতের আলো-বাতাসের সাথে নেচে বেড়ানো সবই হলো। ইন্দ্রনীলের মনেও এখন উচ্ছ্বাস। বাঁধভাঙ্গা আবেগ। ঝামেলা বাধলো আবার রেস্টুরেন্টের ভেতর। ক্যাথির অনুমতি ছাড়াই চিকেনের অর্ডার দিয়ে দিয়েছে ইন্দ্র। গোল বাধালো ক্যাথি।

–আমি চিকেন খাবো না। লবস্টার খাবো।

–আজকের মতো খাও। পরে আবার লবস্টার খেও।

–না তোমার মতো তুমি খাও। আমি লবস্টার খাবো এবং এক্ষুণি খাবো।

–তোমার সাথে আমার কিছুই মেলে না। সেদিন রাতে সোনারগাঁও-এ আমি বললাম লবস্টার খাবো, তুমি ভেংচি কেটে মুখ বেঁকালে। যেন লবস্টার মানুষ খায় না। বললে চিকেন খাবে। আজ আমি যেই বললাম চিকেন খাই, সেই অমনি তোমার লবস্টার খাওয়ার সাধ জাগলো।

–মাইন্ড করো না ইন্দ্র। তুমি জান না আমার রুচি ক্ষণে ক্ষণে পাল্টায়।

–সব কিছুতেই রুচি পাল্টায়?

–ধেৎ অসভ্য।

আকাশ থেকে চুইয়ে চুইয়ে সন্ধ্যা নামে। তার সাথে নামে আঁধার। রাত নামে এদিক-সেদিক সবখানে। ক্যাথির পরনে ফিনফিনে নাইটি। ইন্দ্রনীলের কাছে আজ এক দুষ্প্রাপ্য রাত। ওর চোখের সামনে এক নারীর ভালোবাসা জড়ানো তন্দ্রালু দৃষ্টি ও একজোড়া ভেজা ঠোঁট। তির তির করে কাঁপছে ক্যাথির ঠোঁট। এ যেন স্বপ্নিল ক্ষণ। বাইরে জ্যোৎস্নাসিক্ত মায়াবী রাত। আকাশ ভরা তারা আর তার সঙ্গে মৃদুমন্দ শীতল হাওয়া। ক্যাথির ঠোঁটের কোণে সেঁটে আছে অদ্ভূত হাসি। হৃদয়ে তখন ভালোবাসার প্লাবন। এক নারীর শরীরী উপস্থাপনা, তার দু'চোখে শুধুই অনন্ত আহবান। নিঃসঙ্গ দ্বীপে সূর্য স্নানরতা বিবসনা সুন্দরীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যেমন ঘোর লাগে তেমন ঘোরে আচ্ছন্ন ইন্দ্র। যেন নীল সমুদ্রের সোনালি বালু বেলায় নিজেকে মেলে ধরেছে এক নারী। সে প্রকৃতির মতোই উতলা। সব কিছু দিয়ে নিঃস্ব হওয়ার জন্য সে ব্যাকুল। প্রকৃতির মতোই সে সজীব আর সতেজ, চোখেমুখে তার মায়াবী সম্মোহন। এ নারী সূর্যের সাতরঙ্গা রশ্মির মতো পেলব আর বিকেলের স্থলপদ্মের মতো কোমল। অদ্ভূত এক রংধনু রং-এর স্বপ্নের ঘোর পেয়ে বসে ইন্দ্রনীলকে। ক্যাথির চোখেমুখে রূপোলি খুশির ঝিলিক।

চোখ বুঁজে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে ক্যাথি। যেন ক্যানভাসে আঁকা ছবি। শ্বেত-শুভ্র বিছানার চাদরটি যেন ওর ঈষৎ হলুদাভ শরীরটাকে আরো স্পষ্ট করে তুলতে চাইছিল। যেন দুরন্ত কোন মেঘ বালিকা আকাশের বুকে মাথা রেখে শুয়ে আছে চুপটি করে। ইন্দ্রনীলের যাবতীয় পৌরুষ স্পর্ধায় লীন হতে চায় ক্যাথির ওপর। শরীর কখনো কারো অধীন থাকে না সারাজীবন। ইন্দ্র ফিস ফিস করে ক্যাথির কানে বলে।

–তুমি তন্বী নও, কিন্তু তুমি তীক্ষ্ণ ও তিলোত্তমা।

শরীরী উন্মাদনার উন্মাতাল হাওয়া ছুঁয়ে যায় দু'জনকে। রাতের ছন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠে ইন্দ্রনীলের পৌরুষ চিহ্ন। দু'টি অগ্নিশিখা যেমন পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে এক হয়ে লীন হয়ে যায় ঠিক তেমনি ওরা দু'জন। ভালোবাসার অনির্বাণ আগুন ক্রমশ গ্রাস করে ক্যাথির নাভি, ঊরু, জানুসহ যাবতীয় সত্তাকে। পূর্ণ আনন্দে ক্যাথি নামের মেয়েটি ব্যর্থভাবে যেন ছুঁতে চায় আকাশের ঐ চাঁদটাকে।

বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে আছে ইন্দ্রনীলের কপালে।

–একি ইন্দ্র তুমি অ্যাতো ঘেমেছ কেন?

–কৈ।

–ঐ যে তোমার কপালে ঘাম।

–এ আমার ঘাম না তোমার ঘাম।

–থাক বাবা ঘামের ডিএনএ টেস্ট করে বের করতে হবে না এটা কার ঘাম। এদিক এসো মুছে দেই।

নিজের রুমাল দিয়ে ক্যাথি ইন্দ্রনীলের কপালের ঘাম মুছিয়ে দেয়। ক্যাথি ফিস ফিস করে ইন্দ্রকে বলে।

-জান ইন্দ্র তোমার কাছে এলে না আমার কেন যেন নিজেকে আনম্যারেড আনম্যারেড মনে হতো।

–মনে হতো, এখন হচ্ছে না?

–এক্ষুণি আমার অনুভূতিটা বদলে গেল।

–তার মানে?

দু'জনেই একসাথে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে বিষমভাবে। যেন আর আলাদা হওয়ার দরকার নেই। চরাচর চুঁইয়ে চুঁইয়ে নেমেছে আঁধার। এতোক্ষণ আড়ালে থাকা তারাগুলো একে একে প্রকাশিত হয়েছে নিজ নিজ দীপ্তি আর উজ্জ্বলতা নিয়ে। চাঁদও আজ অকৃপণ। যেন আজ আকাশে চাঁদ উঠেছে শুধু নিজেকে উজাড় করে বিলিয়ে দিতে। মায়াবী অনুভূতি দু'জনের মনে। কখন ক্যাথির বুকে ইন্দ্র ঘুমিয়ে গেছে তা কেউ জানে না। স্তব্ধ সুন্দর প্রকৃতির সময়ের পল, উপ-পল পেড়িয়ে যায় আপন খেয়ালে। কখন রক্তে রাঙ্গা হয়ে গেছে পূর্বদিগন্ত তা ওরা টেরও পায়নি। চোখ মেলেই ক্যাথির সামনে ইন্দ্রনীলের নিদ্রাচ্ছন্ন অবয়ব। এ যেন কাকভোরে জানালা খুলে ভোরের আলোর পরশ– প্রথম সূর্য দ্যাখা। ক্যাথি লজ্জায় অবনত হয়ে দু'জনের দিকে তাকায়। ঈষৎ লজ্জায় রাঙ্গা হয় ওর মুখ। মুচকি হেসে বিছানা থেকে নামে। ও জানে ভালোবাসা প্রকৃতির মতো উলঙ্গ।

৭

অদ্ভুত ধরনের ভালোলাগা আর ভালোবাসা চলছিল দু'জনের বুকের মধ্যে। দু'টি মানুষের যাবতীয় সত্তা মিলেমিশে একাকার। জীবনের সাথে জীবন, মনের ভেতর মন আর শরীরের বিরুদ্ধে শরীর। এ এক নিভৃত গোপন জীবন।

আজ অফিসে এসেই ক্যাথেরিনের মন তিরিক্ষি। এক কাপ কফি খেয়েই ফোন করে ইন্দ্রনীলকে। এক্ষুণি তলব করা হয়েছে। ইন্দ্রনীল ভাবলো জরুরী কোন অফিশিয়াল কাজ। ছুটে যায় ও ক্যাথির ঘরে।

–সাত সকালে আমাকে ডাকলে কেন?

–আমার মন ভাল নেই। আমাকে একটা চুমু খাওতো–

–এই অফিসের ভেতর!

–তা নয়তো কি? বাইরে দাঁড়িয়ে খাবে? চল তবে বাইরে যাই।

–কি যে বলো না।

–ঠিকই বলি। আমি কি খুব অস্বাভাবিক কিছু চেয়েছি? ঘরতো লক করাই আছে।

–লক থাকলে কি হবে। তোমার ঘরের পর্দার ফাঁক-ফোকর দিয়ে দেখা যেতে পারে।

–ভীতুর ডিম। মনে সাহস নেই আবার প্রেম করার শখ।

–বাজে কথা বলো না তো।

–একদম খাঁটি কথা। তুমি না বলেছিলে তোমার হার্ট দুর্বল, হার্ট অ্যাটাক হওয়ার ভয়। আমিতো দেখছি তোমার হার্ট ঠিকই আছে, তোমার মেরুদণ্ড দুর্বল। তোমার অ্যাটাক হলে স্পাইন অ্যাটাক হবে।

এ প্রশ্নের উত্তরে কি বলা উচিত তা আর খুঁজে পায় না ইন্দ্র। টেস্ট ক্রিকেটের ওপেনিং ব্যাটসম্যান দিনের প্রথম বলটি ফেস করতে যেয়ে পেছনে ফিরে যদি দ্যাখে উইকেটের মিডল স্ট্যাম্পটা মাটিতে ঘোরপাক খাচ্ছে তার মুখের অবস্থাটা যেমন হয় ঠিক তেমনি অবস্থা ইন্দ্রনীলের।

অতিকষ্টে ইন্দ্রনীল চেয়ারে বসে আস্তে আস্তে বলে–

–তুমি আজ সকাল বেলায় আমার উপর অ্যাতো রেগেছ কেন?

–রাগবো না তো কি? আমি যে সকালে এসেই তোমার রুমে গিয়েছিলাম। তা তুমি দেখেছ?

–দেখেছি।

–কিন্তু এমন ভাব করলে–যেন তুমি আমাকে চেনই না। এমনভাবে তাকালে যেন আমি ভিন গ্রহ থেকে এসেছি।

–তুমি কি পাগল! ও সময়তো ভার্সিটির ছাত্রীরা আমার চারপাশে ছিল।

–হ্যাঁ, ওরাই বা এতো সকালে তোমার ঘরে কি করে?

–আজ ওদের ক্লাস না।

–বন্ধ করো তো এসব ক্লাস ফ্লাস। ওগুলো করতে করতে তুমি বেশি যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছ।

–ধেৎ আরো বেশি রোমান্টিক হচ্ছি।

–রোমান্টিক না ছাই। মাঝে মাঝে এখন ভাব দেখাও, যেন তুমি যোগীপুরুষদের মতো নির্লিপ্ত, নির্বিকার, নির্লোভ, নিরাসক্ত, শুদ্ধাচারী। এ পৃথিবীর কোন ভোগে তোমার আসক্তি নেই।

গত দু'বছরে ক্যাথিকে চিনে ফেলেছে ইন্দ্র। ও ক্যাথির চেয়ারের সামনে যেয়ে আলতো করে চুমুখায় ওর কপালে। ক্যাথি খিল খিল করে হাসে।

–গেলে তো হেরে।

এক নিমিশে ক্যাথির মুখের আদল পাল্টে গেল। এখন দেখে মনেই হবে না এই নারী একটু আগেই রেগে

অগ্নিশর্মা হয়ে বসেছিল। ইন্দ্রনীল জানে ক্যাথির মেজাজের পারদ যতো তাড়াতাড়ি উপরে বেয়ে উঠে আবার তত তাড়াতাড়িই নেমে যায়। কখনও ওর বর্ষার মেঘের মতো গর্জন আবার কখনও বসন্তের ফল্গুধারার মতো উদগত হাসি। ইন্দ্রনীল মুচকি হেসে বের হয়ে আসে ক্যাথির রুম থেকে।

মাত্র দু'দিন পরের ঘটনা। সকালে অফিসে এসেই ক্যাথি গিয়েছিল ইন্দ্রনীলের ঘরে। ইয়াসমীন বললো, ইন্দ্র এখনও আসেনি। কোনোদিন দেরিতে ইন্দ্রকে অফিসে আসতে দেখেনি ক্যাথি। একটু অবাক হয় ও। কোথায় যেন একটা দুষ্টগ্রহ অলক্ষ্যে অপেক্ষা করছিল ওর জীবনে। সবসময় মানুষ ভাবে জীবন হবে ছন্দময়। সব কিছু হবে ছন্দের মধ্যে। জীবন-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, মিলন-বিচ্ছেদ– যাবতীয় সবকিছু। কিন্তু তা কি হয়?

ন'টায় দুঃসংবাদটা বয়ে নিয়ে এলো ডাক্তার সঞ্চিতা।

–ক্যাথি জান– ইন্দ্রনীল স্যার দেশে ফিরে যাচ্ছে। প্রমোশন

নিয়ে লিয়েনে যাচ্ছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে। রাতারাতি ক্যারিয়ার ঘুরে গেল।

চোখের সামনে এক অসঙ্গত অন্ধকার। সম্মুখে স্বপ্ন হারানোর বেদনা। এ যেন এক বিপন্ন বিস্ময়। ঘোর লাগা মানুষের গলায় ক্যাথি উচ্চারণ করে–

–উনি কবে ফিরে যাচ্ছে?

–শুনলাম আগামী সপ্তাহে।

কাল রাতেই মিস্টার পিটার ফোন করে কনগ্রাচুলেট করেছে ইন্দ্রনীলকে। ওর ক্যারিয়ারের এই উত্থানে সবাই খুশি। মিস্টার পিটার বলেছেন, এই পোস্টিংটা রাইট ম্যান ইনরাইট প্লেস ছাড়া আর কিছুই নয়। যা হওয়া উচিত তাই হয়েছে। রাতে আর সকালে মিলে বার তিনেক ফোন করেছে রিটা আর অন্টি। রিটা ফিরে পাবে স্বামীকে আর অন্টি পাবে বাবাকে। পাখী ফিরে যাচ্ছে আপন নীড়ে। এতো তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে তা ইন্দ্র বুঝতেই পারেনি। বিদেশে পোস্টিং হলে চার থেকে পাঁচ বছর থাকতে হয়। এটাই রেওয়াজ। ব্যত্যয় ঘটলো শুধু ওর বেলায়। যে দেশের আলো-বাতাসকে এক সময় অসহ্য মনে হতো সে দেশই আজ ওর সবচেয়ে প্রিয়। সারারাত ইন্দ্র একটু ঘুমায়নি। বিছানা থেকে ওঠে ও হেঁটে যায় ড্রেসিং রুমের দিকে। দূর থেকে ওকে দেখলে মনে হবে A dead man walking. এক বিশাল ট্র্যাজেডির মুখোমুখি ও দাঁড়িয়ে। চারপাশ যখন অসহনীয় হয়ে উঠেছিল, একঘেয়ে জীবন যখন একেবারে নিরর্থক মনে হয়েছিল, বেঁচে থাকার সব জায়গায় যখন ছিল শুধু অন্তহীন অসংগতি তখন অর্থহীন এক অন্তরঙ্গ ভাললাগার মুহূর্ত এসে সবকিছুকে ভুলিয়ে দিল আদর দিয়ে। ইন্দ্র বুঝে এই ভাললাগার ঘোর ওকে দুঃখ দিবে অনেকদিন। গতকাল রাত থেকে বারবার মনে হচ্ছে এ রকম না হলেই হয়তো ভাল হতো।

ক্যাথি অফিস থেকে দু'সপ্তাহের ছুটি নিয়েছে। ইন্দ্রনীলের আজকাল অফিসে আসাটা একেবারেই ফর্মালিটি। লাঞ্চের পর একদম ভালো লাগছে না। একবারও ফোন করেনি ক্যাথি গত ক'দিন। নিজেরও ফোন করতে ভয় লাগছে। কি বলা উচিৎ ভেবে পায় না ও। বারান্দায় এসে বসে ও। অতিক্রান্ত দুপুর। ডালপালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে নেমে এসেছে থোকা থোকা রোদ্দুর। কোন কিছুই ভালো লাগে না ইন্দ্রনীলের। হঠাৎ ফোনটা বেজে ওঠে।

–ইন্দ্র তুমি বাসায় থেকো আমি এক্ষুণি আসছি।

কেন যেন মনে হলো ক্যাথির উচ্চারণগুলো খুবই শান্ত ও স্থির। কথা শুনে মনেই হলো না গত ক'দিনে ওর জীবনে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে গেছে। এখন শুধু অপেক্ষা। আধ ঘন্টার মধ্যে ক্যাথি এলো। এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ইন্দ্র ওর মুখের দিকে। ইন্দ্রনীলের দৃষ্টি যেন মহাকালের মতো থমকে যেতে চায় ওর মুখে। ক্যাথির দিকে চেয়ে দৃষ্টি বিভ্রম ঘটে ইন্দ্রনীলের। মুখের প্রচ্ছদে জ্বলজ্বল করছে সেই চোখ। তবু কেন যেন মনে হয়, সেই মুখ-চোখ-নাক-ঠোঁট– সবই অতিশয় শান্ত। কেন যেন মনে হয় তা বেদনায় লীন নয়। এক নির্বোধ

ভাগ্যের খামখেয়ালির কাছে যে ও আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে তা ওকে দেখে ঠাহর করা যায় না। ইন্দ্রনীল কোন রা করে না। বিধাতা যখন কোন মানুষের ওপর পরাজয়ের কালিমা চাপিয়ে দেয় তখন চুপ থাকাই উত্তম।

এই মুহূর্তে ঘরটা নিস্তব্ধ-নিঝুম। ইন্দ্রনীল আর ক্যাথির বুকের ভেতর বেজেছে নিঃশব্দ শোকভেরী। ইন্দ্রনীলেরটা অনুমান করা যায় কিন্তু বুঝা যায় না ক্যাথিকে দেখে।

নীরবতা ভাঙ্গে ক্যাথি।

–তোমার ফ্লাইট কনফার্ম করেছো?

–হ্যাঁ।

–কবে?

–সোমবার। রাত আটটায়।

আর মাত্র তিন দিন। ক্যাথিকে ছেড়ে নিউইয়র্ক পাড়ি জমাবে ইন্দ্র। একটা রাত মরে যায় শুধু পরদিন একটা নতুন সকাল জন্ম নেয়ার জন্য। প্রতিদিন একটা নতুন সকাল এসে আগের দিনটাকে স্মৃতির কোঠায় ঠেলে দিবে। এই তো নিয়ম। হয়তো এর ব্যতিক্রম হবে না ওদের দু'জনেরও। ক্যাথি অবিন্যস্তভাবে আদর করতে থাকে ইন্দ্রকে। ফিস ফিস করে বলে,

–আমিতো আগেই জানতাম তুমি একদিন চলে যাবে। আমি এর জন্য তৈরী হয়েই ছিলাম।

–তোমার খারাপ লাগছে না।

–সেতো তোমার চেয়ে ভাল আর কেউ জানে না। তবু না মেনে উপায় কি?

–তোমাকে এ ক'দিনের জন্য দুঃখ দিয়ে গেলাম।

–ছি! ইন্দ্র। দু'বছর কি মাত্র ক'দিন হলো? তোমার আর আমার হৃদয়ের বন্ড হাজার বছরে গড়া। যুগ যুগ একঘরে থেকেও স্বামী-স্ত্রীরা এতো কাছাকাছি আসতে পারবে না কখনও।

–তুমি অ্যাতো ভালোবাস আমাকে। তুমি কি সত্যিই স্যাটিসফাইড।

–জান ইন্দ্র, সত্যিকার ভালোবাসার একটা মুহূর্ত নামগোত্রহীন হাজার বছরের ভালবাসার চেয়েও শ্রেয়।

–আমার প্রতি তোমার কোন অভিযোগ নেই?

–কারুর প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই। আমার ভেতর স্বপ্ন ও স্বপ্ন-ভাঙ্গার অযুত-নিযুত ঘটনা লেখা আছে। জীবনের এক অপরূপ রহস্য আর ভালোবাসা অবলোকনের অবকাশ দেয়ার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমার কোনো অভিযোগ নেই তোমার প্রতি অথবা জীবনের প্রতি।

আজ বিচ্ছেদের ঘোরে কেটে গেল কয়েক ঘন্টা। বারবার ক্যাথির মোবাইলটা বাজছিল।

–কে ফোন করছে বারবার?

–আমার হাজব্যান্ড।

–রাত এখন ন'টা। তুমি যাবে না?

–আমি আরো পরে যাবো। আমাদের বন্ধনের শর্ত ভুলে যাও কেন ইন্দ্র? আমি বলেছি না, আমি নিজের ইচ্ছে মতো আসবো আবার নিজের ইচ্ছায় যাবো।

–ড্রাইভার যদি বলে দেয় তুমি কোথায় ছিলে?

–তাতে আমার কিছু এসে-যায় না। সত্য সবার জানাই উচিত। এতে কারুর আর দায় থাকে না।

ক্যাথির নিঃশঙ্ক উত্তরে ইন্দ্র অবাক হয়। আজ যেন শুধু ওর বলার পালা।

–ইন্দ্র তুমি-না বলেছিলে যদি আমি স্কলারশীপ নিয়ে বোস্টন যাই তবে হয় তোমাকে সাথে নিতে অথবা মেরে ফেলতে। তুমি তো আমাকে সাথে নেবে না। তুমি আমাকে মেরেই ফেলো। তাহলে আমার আর কষ্ট থাকবে না আগামী দিনগুলোতে।

–তুমি কি পাগল হয়ে গেছো?

–কেন ইন্দ্র। তুমিই না আমাকে শিখিয়েছ যাকে ভালোবাসা যায় তাকে খুন করা কোন পাপ নয়।

–সে তো লেখকের কথা। তাকি কখনও হয়?

ইন্দ্রনীল স্পষ্ট টের পায় ওরই শেখানো বুলি আজ ক্যাথি ওকেই ফিরিয়ে দিয়ে গেল। নির্মম পরাজয় ভালোবাসার মানুষের কাছে। আলতো করে ইন্দ্র বলে–

–ক্যাথি।

–কি।

–দূর থেকে ফোন করলে কি বলবে?

–বলবো ভাল আছি– শান্তিতে আছি– স্বামী-পুত্র নিয়ে সুখের সংসার নিয়ে– দারুন আছি...। আর কি শোনতে চাও?

বাইরে নরম বাতাস ছিল। তার সাথে এক পশলা বৃষ্টির গন্ধও ছিল। মানুষতো আর রোবট নয়। বিছানায় বসে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ক্যাথি আচমকা হাউ মাউ করে কাঁদতে শুরু করে ইন্দ্রনীলের বুকে মুখ লুকিয়ে। এই তৃতীয় বারের মতো ইন্দ্র দেখলো ক্যাথি সত্যি কাঁদতে পারে।

৮

আজ চলে যাচ্ছে ইন্দ্র। গত দু'দিন একবারও ফোন করেনি ক্যাথি। গাড়িটা যখন বিমানবন্দরের দিকে যাচ্ছিল তখনও বারবার মনে হচ্ছিল যদি একবার ক্যাথি আসতো। ডিপারচার লাউঞ্জে ঢুকতে যাওয়ার আগখানে সেই চির চেনা কণ্ঠ।

–ইন্দ্র এতো তাড়া কিসের। আমি তো তোমাকে সীঅফ করতে এসেছি। রিপোর্টিং-এর ঢের বাকী।

এ যেন ভালোবাসার দাবি। ইন্দ্রনীলের বুকের ভেতর হু হু বাতাস বইছে। সে বাতাসে সুখ নেই, শুধু আছে দুঃখের দীর্ঘশ্বাস। সাজানো বাগান শুকিয়ে যাওয়ার বেদনায় বিবশ ওর দেহ-মন। মানুষ কি ভেতর ভেতর চোখের জল ফেলে কাঁদতে পারে! পারলে হয়তো ভাল হতো। এক বীভৎস বাস্তবতার মুখোমুখি ইন্দ্র।

ক্যাথি দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল-নির্বাক। বুকের পাঁজরের ভেতর আটকে থাকা কালবোশেখী প্রচণ্ডভাবে আছড়ে পড়তে চাইছে গোটা শরীরে। তবু সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ চোখ-মুখ। শরীরের তাবৎ অঙ্গ-প্রত্যক্ষ, শির-উপশিরা-তন্তু যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে চাইছে। তবু কান্না নেই মুখে। শুধু দুফোঁটা চোখের জল ঝলাৎ করে পড়লো ইন্দ্রনীলের পায়ের ওপর। ক্যাথিই মুখ খুলে।

–ইন্দ্র, তুমি ভাল থেকো। আর আমাকে ভুলে যেও।

–তুমি পারবে ভুলতে?

–গতকাল থেকে চেষ্টা করছি।

ক্যাথি চলে যায় যন্ত্রচালিত এক মানবীর মতো। যাওয়ার আগে ইন্দ্রকে দিয়ে গেল বিদায়ী-কার্ড। তাতে কি লেখা আছে তা ইন্দ্র এখনও জানে না। ক্রমেই ক্যাথির শরীরটা ইন্দ্রনীলের দৃষ্টির সীমানার আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। ক্যাথি একবারও ফিরে তাকালো না। আলো-আঁধারির লুকোচুরিতে শুধু ইন্দ্রনীলের চোখে পড়ে ক্যাথির শাড়ির উড়ন্ত আঁচলের খসে পড়া ভগ্নাংশ। ইন্দ্রনীলের বুকের ভেতর হু হু করে কান্না। নিমিষে রিক্ত হয়ে যায় জীবনের যাবতীয় উচ্ছলতা। অনাবিল যতো স্বপ্ন ভেঙ্গে পড়া কাচের পাত্রের মতো আর্তনাদ করে উঠছে বারবার। ভালোবাসার সূর্য তখন অস্তাচলে।

নিউইয়র্কগামী বিমান টেক অফ করলো। ইন্দ্রনীল চলে গেল। পেছনে রেখে গেল ক্যাথি আর ইন্দ্র নামের দু'টি নারী-পুরুষের অনির্মিত স্বপ্নগুলো। ভাঙ্গা স্বপ্ন, যার শুধু অতীত আছে ভবিষ্যৎ নেই। উড্ডীয়মান প্লেনের জানালা দিয়ে শেষবারের মতো ঢাকার আকাশ-বাতাস দেখে নেয়ার চেষ্টা করে ইন্দ্র। এই সেই আকাশ, যার সামীয়ানার নীচে ক্যাথি থাকবে আজীবন, এই সেই বাতাস যাতে ক্যাথি শ্বাস-প্রশ্বাস নিবে নিরবধি। ইচ্ছে করে জানালা খুলে হাত বাড়িয়ে চিৎকার করে বলতে– ক্যাথি আমি তোমার জন্যে অনন্ত শূন্যে বাড়িয়েছি আমার দু'হাত।

দু'চোখ গড়িয়ে পড়ছে জল। কার্ড পড়ছে ইন্দ্র। ক্যাথি লিখেছে– ইন্দ্র, তুমি আমাকে কখনও ফোন করো না, চিঠি লিখো না অথবা ই-মেইল করো না। আমি তোমার মতো ভাল মানুষ নই। তোমার কথা শুনলে আমার মন ভরে না, তোমাকে শুধু ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে বারবার। ফোন করে আমাকে বারবার দুঃখ দিও না। কখনও আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ো না, যদি তা কোনদিন সম্ভবও হয়। আমি জানি, তুমি আমার সব শর্ত মেনে নাও নির্দ্বিধায়। আমার কাছে তুমি হেরে গেলে আমার সহ্য হয় না। যদি কোনদিন কেউ হেরে যাই, সে যেন আমি হই, কখনও তুমি না। তোমার কাছে বারবার হেরে যেতেও সুখ।

ইন্দ্রনীল উড়ে গেল আকাশে, শুধু পেছনে রেখে গেল এক জোড়া বিবাহিত নারী-পুরুষের পূর্বরাগ, মিলন আর বিচ্ছেদের এক ট্রাজিক ট্রিলজি। কে হেরে গেল, ইন্দ্র না ক্যাথি– এ প্রশ্ন নিরুত্তরিত থাকবে অনন্তকাল। ক্যাথির আস্তিত্বে ইন্দ্রনীলের অভাব চোখে দ্যাখা যায় না, শুধুই অনুভব করা যায়। দীর্ঘ দু'বছর যে মানুষটি ছিল ক্যাথি'র অস্তিত্বের অংশ সে আজ দূর বহুদূরে। ইন্দ্রনীল একদিন চলে যাবে এ বিষয়টা ক্যাথির কাছে অনেক সময় পরিহাসের মতো শোনালেও তা ছিল একেবারেই সত্যের কাছাকাছি। সেই নির্মম সত্য মহাকালের মতো থমকে দাঁড়িয়েছে ক্যাথির দু'চোখের সামনে।

সময় নিজে বদলায়, বদলিয়ে দেয় মানুষগুলোকেও। একটা মানুষ যখন অন্য একটা মানুষকে ছেড়ে অনেক দূরে চলে যায় তখন পেছনে কিছু স্মৃতি রয়ে যায়। এমন কিছু স্মৃতি রয়ে যায় যা বুকের ভেতর উল্টে-পাল্টে দেখলে শুধু কষ্ট হয়। ক্যাথির বুকে এখন অযুত নিযুত কষ্টের ভিড়।

রাতে ঘুম আসে না। ক্যাথি এসে ব্যালকনিতে দাঁড়ায়। আজ প্রায় তিন মাস পার হয়ে গেল ইন্দ্রনীল নামের একটা মানুষ ওর জীবন থেকে বিয়োগ হয়ে গেছে। ইন্দ্র ক্যাথির কথা রেখেছে। একবারও ফোন করেনি দূর থেকে। অঝোরে কাঁদছে ক্যাথি। বোস্টন স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন থেকে চিঠি এসে গেছে। মার্চের এক তারিখ থেকে ক্লাস শুরু হবে। ইন্দ্র কাছে থাকলে যারপরনাই খুশী হতো। কারণ এ স্কলারশীপ পাওয়ার কলকাঠি তো ইন্দ্র নিজেই নেড়েছিল। আর দু'মাস পরেই ক্যাথি চলে যাবে বোস্টনে এক বছরের জন্য। স্বামী ডেভিড আর দু'ছেলে জিশান আর জন থেকে যাবে এ দেশে। ডেভিড অনেক দিন থেকেই লক্ষ্য করেছে ক্যাথির মন ভাল নেই। ভেবেছে হয়তো অফিসে কোন খিটিমিটি লেগেছে। তাই ক্যাথির মনের এই ভাবান্তর। বিছানা ছেড়ে ডেভিড স্ত্রীর কাছে এসে দাঁড়ায়। চারদিকে ঘন-ঘুটে অন্ধকার।

–ক্যাথি তুমি ঘুমাবে না?

–আমার ভাল লাগছে না। তুমি শুয়ে পড়।

–তোমার অফিসে কি কোন গণ্ডগোল। অথবা অন্য কিছু?

–আমার কিছু হয়নি। প্লিজ আমাকে ডিসটার্ব করো না।

ডেভিড চলে যায় ঘরের ভেতর। স্ত্রীর এই ভাবান্তরের কোন কারণ সে নিজেও জানে না। ইদানীং কোন কিছুই ক্যাথির ভাল লাগে না। ক্যাথেরিনের এই অসহায়ত্ব মাঝে মাঝে ওর মনের ভেতর অবাস্তব অসঙ্গতিপূর্ণ কিছু ভাবের জন্ম দেয়। অনেক সময় অতি পরিচিত অতি আপন মানুষকেও সম্পর্কহীন মনে হয়।

ব্যালকনিতে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে ক্যাথি। ও জানে বিছানায় গেলে কোন লাভ নেই। বরং অস্বস্তিটা বাড়বে। ভয়াবহ ইনসোমনিয়া গ্রাস করেছে প্রতিটি রাতকে। জীবনে চলছে নিরন্তর নির্ঘুম। আজও ঘুম আসছে না। শীতের সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়া। হিমেল হাওয়ায় কাঁপুনি ধরে দেহে। রাত আরো নিঝুম হয়। এক কুয়াশার চাদর ওকে করেছে নিঃসঙ্গ। যেদিন ইন্দ্রনীল উড়ে চলে গেছে নিউইয়র্ক, সেদিন থেকেই বেগোছ হয়ে গেছে ক্যাথির দিন-কাল। জীবন যেন শুধুই নষ্ট-চেতন।

দু'মাস পরেই ক্যাথেরিন উড়ে যায় বোস্টনে। এক বছর কাটাতে হবে পাবলিক হেল্‌থে মাস্টার্স করতে। কতোবার ভেবেছে ইন্দ্রনীলকে ফোন করবে। কিন্তু কোনদিন করা হয়নি। ক্যাথি জানে ইন্দ্রনীলের ব্যক্তিসত্তাকে। ক্যাথি যা পছন্দ করে না, ইন্দ্র তা কখনও করবে না। ক্যাথি তো নিজেই শর্ত দিয়ে দিয়েছে, কোন যোগাযোগ করা যাবে না। ক্যাথি অনুভব করে ঐ মুখচোরা মানুষটা যতোই দুঃখ পাক, যতই একাকীত্বে ডুবে থাক কখনও ক্যাথির কথাকে অমান্য করবে না।

দু'মাস পেরিয়ে গেছে ক্যাথেরিনের কোর্স। ইন্দ্রনীলকে কি অন্তত একবার ফোন করা উচিত? এক পা এগুলে দু'পা পিছিয়ে যায় ও। ওর জন্য অন্য সংসারে ভাঙ্গনের সুর বেজে উঠুক তা ক্যাথি কখনও চায় না। কারণ নারী-পুরুষের ভালবাসা যে কোন সময় সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটিয়ে ফেলতে পারে। তাই বারবার ফিরে যায় ক্যাথি ও-পথ থেকে।

দশ মাস কেটে গেল স্কুলে। কোর্স প্রায় শেষের দিকে। কোর্স মেটরা সবাই যাচ্ছে বাফেলোতে নায়াগ্রা দেখতে। বোস্টন থেকে সবাই একবার নিউইয়র্কও যাবে। নিউইয়র্ক কথাটা শুনলেই মন ধুকপুক করে ক্যাথির। ওখানেই তো ইন্দ্রনীলের বসত। মনে মনে ও ঠিক করে ক্যাথি যাবে ইন্দ্রনীলের বাড়ী। কি আর হবে। চোখের দ্যাখাতো হবে। রিটা তো আর জানবে না তার স্বামীর সাথে ক্যাথির কি অন্তঃস্থ সম্পর্ক আছে। শুধু ক্যাথিকে হেরে যেতে হবে ইন্দ্রনীলের কাছে। প্রিয় মানুষের কাছে বারবার হেরে যাওয়ায়ও সুখ।

গ্রে-হাউন্ড এয়ারকন্ডিশন গাড়ীগুলো সাঁ সাঁ বেগে ছুটছে নিউইয়র্কের দিকে। পরিষ্কার রাস্তাঘাট। ট্রাফিক জ্যাম নেই এতোটুকু। আশা-নিরাশার বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে ক্যাথেরিনের মন। মন বারবার বলছে, হে ইশ্বর তুমি আমায় হারানো নিধিকে ফিরিয়ে দাও। মাত্র দুঘন্টার জার্নিতে ওরা পৌঁছে গেল নিউইয়র্কে।

বিকেল না গড়াতেই ক্যাথি রওনা হলো ইন্দ্রনীলের বাড়িতে। ডায়রিতে লেখা ঠিকানাটা বারবার পরখ করে নিল। মনে আনন্দ। এতো বড় সারপ্রাইজ হয়তো ইন্দ্র আর জীবনেও কোন দিন পায়নি। সাত সমুদ্র তের নদী পেড়িয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ নারী আজ চলে এসেছে ইন্দ্রনীলের আয়ত্বের সীমানায়।

ম্যানহাটনের বাড়ির ঠিকানাটা খুঁজে পেতে ক্যাথির কোন অসুবিধাই হলো না। কলিং বেল টিপেই নিরন্তর প্রতীক্ষা। নাড়ীর গতি যেন আর সংখ্যার নিয়ম মানছে না। এই বুঝি ভেতর থেকে বের হয়ে এলো ইন্দ্রনীল। ইন্দ্র এলো না। যে বের হলো তিনি একজন মাঝ-বয়সী মহিলা। জানতে চাইলো কেন ক্যাথি এখানে এসেছে। ভেতরে নিয়ে গেল। রুমে বসতেই আনন্দের ঝিলিক খেলে গেল ক্যাথির চোখে। ড্রইং রুমে বিশাল ফ্যামেলি পোট্রেট। ইন্দ্রকে চেনা যায় অতি সহজে। নিশ্চয়ই ওর পাশে রিটা আর ছোট্ট মেয়েটি অন্টি।

ভদ্র মহিলা নিজেই পরিচয় দিল, সে ইন্দ্রনীলের কাকীমা। কিন্তু তার চোখে-মুখে বিন্দুমাত্র সাদর সম্ভাষণের অভিব্যক্তি নেই। যেন না এলেই ভাল হতো। অনেক দ্বিধা নিয়ে ক্যাথেরিন বললো,

–আন্টি, ইন্দ্রনীল কি এখন নিউইয়র্কেই আছে? আমি ওর কলিগ। এক সাথে কাজ করতাম ঢাকায়।

অনেকক্ষণ ভদ্র মহিলাটির মুখ দিয়ে রা সরে না। কি বলা উচিত তা যেন খুঁজে ফিরছিল তার মন।

–তোমরা কোন খবর জানো না?

–কি খবর!

ইন্দ্র তো নেই।

–নেই মানে, ও কোথায়?

–ওতো ছ'মাস আগে নিউজার্সিতে কার এক্সিডেন্টে মারা গেছে।

উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ যেমন কূলে থাকা প্রস্তর খণ্ডের সাথে ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় নিমেষে, ঠিক তেমনি চূর্ণ হয়ে গেল ক্যাথির ভালবাসা। ওর উজ্জ্বল দুটি চোখের তারায় মুহূর্তে মেঘ নেমে এলো। বিবশ হয়ে আসছে শরীর, মন আর যাবতীয় অস্তিত্ব। এক বিভৎস বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে ক্যাথেরিন।

ওখান থেকে ক্যাথি সরাসরি চলে যায় ইন্দ্রনীলের স্মৃতিচিহ্নের কাছে। ধূসর পাথরে উৎকীর্ণ ইন্দ্রনীলের নাম। নিচে জন্ম-মৃত্যু তারিখ। ক্যাথেরিনের চেয়ে বয়সে মাত্র চার বছরের বড় ছিল ইন্দ্র। কিন্তু সদা প্রাণবন্ত থাকতো কিশোরের মতোই। এ মৃত্যু একেবারেই অপরিণত। বারবার ক্যাথির মনে পড়ছে বাবা-হারা ছোট্ট মেয়ে অন্টির কথা।

প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় ক্যাথেরিনের মুখটা বড়ই বিবর্ণ আর ম্রিয়মাণ। এক দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে স্মৃতি-চিহ্নটির দিকে। জীবনের যে টুকরো সময়কে মনের অন্তঃস্থলে নিভৃত যতনে ও লালন করছিল সময় তার ওপর লেপে দিয়েছিল বিস্মৃতির ঘন আস্তর। ক্যাথি কি জানতো এতোদিনের ব্যবধানে সে অনপনেয় কালিকে সরিয়ে সেই ভালবাসাকে তুলে আনতে গিয়ে ওকে এমনিভাবে নির্বাক হয়ে যেতে হবে।

৯

স্বপ্নচারীর মতো খেলা করছে দুটি মানব-মানবী। আনন্দের এক সুতীব্র অনুভূতি একজনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে আর একজনের দেহে ছড়িয়ে পড়ছে। যেন পৃথিবীর যাবতীয় সুখ এখন দু'জনের আয়ত্বের মধ্যেই। আলতো করে ইন্দ্রনীল ক্যাথিকে বলে,

–ক্যাথি, তুমি যে প্রায় দিন অফিস শেষে আমার বাসায় আস তোমার লজ্জা করে না?

–এদিকে মাথাটা আন, উত্তরটা কানে কানে বলি।

–বল।

–এখন আর তোমার কোন কিছুতেই আমার লজ্জা করে না, বরং হাজব্যান্ডকেই আজকাল লজ্জা পাই।

–ধেৎ।

দু'জনেই একসাথে হেসে ওঠে। ইন্দ্রনীল ক্যাথিকে আবার বলে,

–তোমার বয়স যখন পঞ্চাশ হবে তখনও কি তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে আমার কাছে আসবে?

–কখনও আসবো না।

–কেন?

–ধুর বোকা, ঐ সময় তো তুমি আমার কাছেই থাকবে সারাক্ষণ। আসতে হবে কেন?

স্বপ্নটা এক নিমেষে চলে যায়। ঘুম থেকে জেগে হাঁপাতে থাকে ক্যাথি। গত এক সপ্তাহ থেকে এক ধরনের পাগলেটে অবসেশন ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে। রাতে শুধু স্বপ্নের পর স্বপ্ন। ইনসোমনিয়া থেকে বাঁচার জন্য নানা রকমের ঘুমের ওষুধ খেয়েও কোন লাভ হচ্ছে না। ঘুমালেই স্বপ্ন। শুধু ইন্দ্রনীলকে নিয়ে। এক যুগ কেটে গেল। এখনও ইন্দ্র ও ক্যাথি স্বপ্নে খেলা করে। ঘুম ভাঙ্গার পরও ক্যাথি ভাবে এ যেন বাস্তব। মনে হয় যেন এইমাত্র ইন্দ্রনীলের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে ছিল। কেন যেন মনে হয় ইন্দ্রনীলের শরীরের গন্ধ সেঁটে আছে ওর শরীরে। ক্যাথি ঘামতে থাকে ভয়ে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গতি আরো চঞ্চল হয়। রাত তখন তিনটে। ক্যাথি ডেকে তুলে ডেভিডকে।

–অ্যাই শোন, আমার ভয় করছে।

–কেন, কি হয়েছে?

–কে যেন স্বপ্নে আমার সাথে কথা কয়। আমাকে নিয়ে খেলা করে।

গত ক'দিন থেকেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করছে ডেভিড। ওর ধারণা ক্যাথির মানসিক বিভ্রম হয়েছে। তবে কি স্ত্রীকে সাইকিয়াট্রিষ্টের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত?

জন্মদিনটা এলেই ক্যাথির ভেতর বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা দেয়। এটা ওর পঞ্চাশতম জন্মদিন। বুড়িয়ে যাচ্ছে শরীর, কিন্তু শরীরের বয়স এতটুকু ছায়া ফেলেনি মনে। জন্মের এই সুবর্ণ জয়ন্তীতে ক্যাথিকে গাড়ি প্রেজেন্ট করার কথা ছিল ইন্দ্রনীলের। কিন্তু কি সুন্দর জীবনের সাথে সব বোঝা-পড়া শেষ করে ইন্দ্র চলে গেল। শুধু পেছনে রেখে গেল অসহিষ্ণু স্বপ্নগুলো। একযুগ আগে মনে হয়েছিল, হয়তো আগামী বছরগুলোর স্পষ্ট দিনের বেলায় ইন্দ্র নামের একজন মানুষকে অর্থহীন কায়া বলে মনে হবে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। ইন্দ্রনীল স্থির জেগে আছে ক্যাথেরিনের অন্তরে। আজো জীবনের চারদিকে ইন্দ্রকে নিয়ে বুভুক্ষ স্বপ্নময় ভুতুরে হাতছানি। স্মৃতির আঙ্গিনায় দোল খায় শুধু প্রিয় মানুষের মুখ।

দিন বদলে যায়। বদলে যায় মানুষের জীবন। একমাত্র ইন্দ্রনীলের অন্তহীন ভালবাসা ছাড়া আর সবই পেয়েছে ক্যাথেরিন। যে পোস্টে ইন্দ্রনীল কাজ করতো সে জায়গায় আজ ক্যাথেরিন। কেন ক্যাথেরিন সাত দিনের ছুটি নিয়ে নিউইয়র্কে যাচ্ছে তা ওর অফিসের লোকরা জানে না। এমনকি ভেভিডও জানে না, তার স্ত্রীর কি এমন কাজ এখন নিউইয়র্কে। ক্যাথি জানে এই জন্মদিনে ইন্দ্রনীলের ছোঁয়া না পেলে ওর যাবতীয় মানবীয় সত্তা একসাথে বিদ্রোহ করবে।

জন্মদিনের প্রথম প্রহরেই ক্যাথি পৌঁছে যায় ইন্দ্রনীলের স্মৃতি-ফলকের কাছে। নামটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে গত বার বছরে। কষ্ট করে পড়তে হয়– কার দেহাবশেষের শেষ অংশটুকু লুকিয়ে আছে এই প্রস্তর খণ্ডের আড়ালে। এক গোছা মজা ফুলের পাপড়ি লুটিয়ে পড়ে আছে স্মৃতি-ফলকের ঠিক সামনে। কে জানালো এই ফুলেল ভালবাসা। হয়তো অন্টি দিয়ে গেছে বাবাকে। কোথায় আছে অন্টি? কেমন আছে ইন্দ্রনীলের মেয়ে, তার কিছু জানে না ক্যাথি। সবই অনুভব। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ও স্মৃতি-ফলকের দিকে। চোখে পলক পড়ে না। যেন ইতিহাসের এক নির্বাক নিশ্চল পর্বে ও দাঁড়িয়ে আছে। জীবনের যাবতীয় দুঃখ ও যেন এতোদিন খোলসে আটকে রেখেছিল। বুকে দুঃখ, মুখে হাসি– এ এক অসম সহাবস্থান ওর অন্তরে। যন্ত্রণাকাতর মুখ নিয়ে ও দাঁড়িয়ে আছে, প্রিয় মানুষের স্মৃতির বেদীর কাছে। ঐ স্মৃতি-ফলককে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে ক্যাথির, যেমন ও সব সময় ছুঁয়ে থাকতো ইন্দ্রনীলের শরীরকে। এতো প্রস্তর খণ্ড স্পর্শ নয়, এ যেন ইন্দ্রনীলের শরীর ছুঁয়ে দেখা। অঝোরে কাঁদে ক্যাথি আর ফিসফিস করে বলে,

–ইন্দ্র, আজ না আমাকে তোমার গাড়ি প্রেজেন্ট করার কথা। চেয়ে দেখ তোমার ক্যাথি আজ পঞ্চাশে পা দিয়েছে। তুমি তোমার কথা রাখোনি। আমি রেখেছি। তবু তোমাকে আজ আমি ক্ষমা করে দিয়ে গেলাম। সুখে থেকো বন্ধু, পূর্ণিমার চাঁদের মতো, শাশ্বত দীপ্তিতে থেকো ঠিক তারার মতন।

আস্তে আস্তে উঠে আসে ক্যাথি। ওর মুখের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় তখন সূতীব্র বেদনা। এক অনিয়ন্ত্রিত দুঃখবোধের ধাক্কা ও যেন আর সইতে পারছে না। এক অদ্ভুত বেদনা-বিধুর নিঃসীম বেদনায় নীল হয়ে আসতে চায় দেহমন। ভালবাসাহীন দীর্ঘ রজনী দীর্ঘদিন। চির বিচ্ছেদের বেদনায় উপশমের প্রলেপ পড়েনি সময়ের প্রবাহে। যেন সদ্য অতীত ও হাতড়ে বেড়াচ্ছে প্রাণপণে। অস্পষ্ট লাগে সবকিছু– এমনকি ভাবনাগুলোও। স্মৃতি আজো যেন ফিসফিস কথা কয়। কাল নিরবধি মানুষ তো নিমেষ মাত্র। একদিন সবাই স্মৃতি হয়ে যায়।

আস্তে আস্তে বের হয়ে যায় ক্যাথি। একবারও আর ফিরে তাকায় না। মৃত্যুর মহিমা বড়ই রহস্যময়। সিঁম দ্য ব্যুভোয়ার মতো ক্যাথিও বলে, এ পৃথিবীর কোন মৃত্যুই স্বাভাবিক নয়। সব মানুষকেই একদিন মরতে হবে, কিন্তু প্রতিটি মানুষের জন্যই তার মৃত্যু একটা দুর্ঘটনা, সে যদি সে কথা জানেও, যদি তাতে সম্মতিও দেয়। তবুও তা একটা অমার্জনীয় লঙ্ঘন, An unjustifiable Violation.

স্মৃতি-ফলক ছুঁয়ে ক্যাথি ইন্দ্রনীলকে কথা দিয়ে গেছে সূর্যকে ঘিরে পাক খাওয়া এক বেয়াড়া গ্রহের মতো ইন্দ্রকে ও ঘিরে রাখবে আজীবন। ইন্দ্র ক্যাথিকে ছুঁয়ে থাকবে না, কিন্তু জড়িয়ে থাকবে আজীবন।

স্মৃতি-ফলককে আদর করে ক্যাথি বলেছে– তোমার আমার সম্পর্ক কাল-কালান্তরের, জন্ম-জন্মান্তরের, এ সম্পর্ক আমি নিজে নিঃশেষ হওয়ার আগে হারিয়ে যাবার নয়।

এ ভালবাসা পরিণতিহীন ছিল, কিন্তু তা প্রতিশ্রুতিহীন কখনো ছিল না। কতো ভালবাসা আসে আবার হারিয়ে যায় নিঃসীমের গভীরে। একটি নিভৃত ভালবাসা থাক না ক্যাথির মনের অন্তরালে।